DISCOURSE ON THE BENGALI
LANGUAGE AND LITERATURE

(WITH A BRIEF ACCOUNT OF THE LIVES OF THE FAMOUS BENGALI AUTHORS TOGETHER WITH SHORT CRITICISMS ON THEIR WORKS)

PART I.

BY

RAMGATI NYAYARATNA.

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব।

(বিখ্যাত বাঙ্গালাগ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎসমালোচনাসমেত)

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামগতিন্যায়রত্নপ্রণীত।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৯।

Price 1 *Rupee* মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়কপ্রস্তাব' নামক এই পুস্তক খানি অনেকদিনহইতে আমি লিখিতে আরম্ভকরিয়াছি। ইহার মুদ্রণকার্য্যও অনেকদূর সম্পন্ন হইয়াছে। পুস্তকখানি যেরূপ হইবে, পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক বৃহৎ হইলে সুতরাং মূল্যও কিঞ্চিৎ অধিক করিতেহয়, কিন্তু একেবারে অধিকমূল্যে পুস্তক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সুবিধা হয় না, এই ভাবিয়া ইহাকে দুইভাগে প্রকাশকরিবার মানসে এক্ষণে প্রথম-ভাগ প্রচারিত করিলাম। এইভাগে বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীনকালহইতে আরম্ভকরিয়া রামপ্রসাদসেনের বিদ্যাসুন্দররচনার সময়পর্য্যন্ত এই কালমধ্যে উক্তভাষার যে যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে—ঐ কালে রচিত প্রধানপ্রধান বাঙ্গালাগ্রন্থসকলের সংক্ষিপ্তসমালোচনা-সহকারে—তাহার উল্লেখ, এবং তত্তদ্‌গ্রন্থকারগণের কিঞ্চিৎ জীবনবৃত্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে ভারতচন্দ্রের সময়হইতে বর্ত্তমানকালপর্য্যন্তের প্রধান প্রধান কতিপয়গ্রন্থকারের জীবনবৃত্ত এবং ঐ কালে রচিত কতকগুলি গ্রন্থের সমালোচনাপ্রভৃতি সংক্ষেপে সঙ্ক-লিতথাকিবে। এরূপ পুস্তকের বিজ্ঞাপন যেপ্রকার বিস্তৃতহওয়া উ-চিত, এ ভাগে সে প্রকার বিজ্ঞাপন দিতেপারিলাম না—দ্বিতীয়ভাগে দিবার ইচ্ছা রহিল; সে ভাগও যন্ত্রস্থ।

এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমার বিনয়বচনে নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, আমি এইগ্রন্থপ্রণয়নের জন্য সংবাদসংগ্রহে সাধ্যমত যত্ন করিতে ক্রটি করিনাই, কিন্তু এপ্রকার গ্রন্থ যেরূপ হইলে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেপারে, সেরূপ করিতে পারিয়াছি, তাহা কোনমতে সম্ভব নহে। ইহাতে বিস্তর ভ্রম—বিস্তর অসঙ্গতি—ও বিস্তর দোষ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিধ পুস্তকরচনা-পক্ষে ইহা একপ্রকার প্রথম উদ্যম, অন্ততঃ এ অনুরোধেও যদি তাঁ-হারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেইসকল ভ্রমাদি মার্জ্জনাকরেন এবং উপদেশবাক্যে সেইগুলি আমাকে দেখাইয়া দেন, তাহাহইলে তাঁহা-দের নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। ইত্যলম্।

বহরমপুর কালেজ
৪ঠা শ্রাবণ সংবৎ ১৯২৯

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।
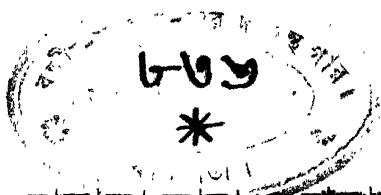
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
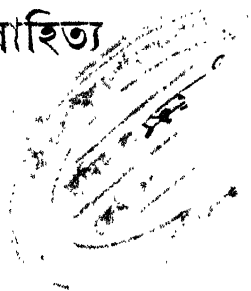
যে ভাষাতে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে ইহারই নাম বাঙ্গালা ভাষা। কোন্ সময়ে যে এই ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার নির্ণয় করা অতি দুষ্কর। যদি প্রাচীন কালের একজন বৃদ্ধ লোকের দেখা পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিহাসকে ঐরূপ প্রাচীন পুরুষ বলিয়া লোকে গণনা করে কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেরূপ ইতিহাসের একান্ত অসদ্ভাব।

অনেকে অনুমান করেন বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষা একদাই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে; সে অনুমান সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সমুদয় বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্ব মুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু র্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্ক শাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥

ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তি রিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তি রিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণে মেতৎ কথিতম্" ইত্যাদি।

'এক্ষণে আমি ককারের তত্ত্ব নিরূপণ করিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকারা অর্থাৎ আকুঁড়ি কুণ্ডলী নামক দেবতা এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা-নামে ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জেষ্ঠা নামে বিষ্ণুশক্তি এবং দক্ষিণ কোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিত আছেন। ককার ত্রিকোণ' ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনা বাঙ্গালা ককার ব্যতিরেকে দেবনাগরের ককারে কখন সঙ্গত হয় না। কারণ উহা (क) ত্রিকোণ নহে। তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও এইরূপ বিবরণ আছে। সুতরাং স্মৃতি ও রামায়ণাদির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রকে অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা অক্ষরও অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তন্ত্রের ভাষা ও বর্ণিত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিয়া এক্ষণে অনেকেই তন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোন কোন তন্ত্র খুব আধুনিক হইতে পারে কিন্তু সকল তন্ত্রই যে তত আধুনিক তাহা বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'দীক্ষাতত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা

তান্ত্রিক সংস্কার—বৈদিক নহে। ঐ পুস্তকে তিনি বীর-তন্ত্র যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন আকবর সাহের সমসাময়িক—অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত—বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রঘুনন্দনের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিলে তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব মধ্যে দীক্ষা-তত্ত্ব লিখিতে যাইতেন না। আমাদের দেশে—যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, সেখানে—যে অতি অল্পকালের মধ্যেই কোন গ্রন্থ বিশেষরূপে প্রচলিত হইবে তাহা সম্ভব-পর নহে। অতএব রঘুনন্দনের অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তন্ত্র-শাস্ত্রের সুতরাং তন্ত্রবর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এক প্রকার স্থির হইতেছে।

সুন্দরবনস্থ ভূমির মধ্যহইতে কখন২ যে সকল তাম্র-ফলক পাওয়া যায়, তাহার একখানি দর্শন করা গিয়াছে। উহা রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকারকালে কোন ব্রাহ্ম-ণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্র স্বরূপ। উহা কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর নামক গ্রামের কোন জমীদার উহা পাইয়াছিলেন; উহার অক্ষর এরূপ নূতনপ্রকার যে, অনেকে উহা পাঠ করিতে পারেন নাই। সেই অক্ষর না দেবনাগর না বাঙ্গালা।

কতকগুলির দেবনাগরের, ও কতকগুলির বাঙ্গালার সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব অনুমান হয় উহা দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর উৎপন্ন হইবার সন্ধিকালে লিখিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল, অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, ঐ সময়েই দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দেবনাগর হইতেই যে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অদ্যাপি দেখা যায়—

ग   घ   ङ   ड   थ   न   प   म   य   श

গ   ঘ   ঙ   ড   থ   ন   প   ম   য   শ

প্রভৃতি বর্ণগুলি উভয় বর্ণ মালাতেই প্রায় অবিকল এক রূপ। দেবনাগর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দেশ ব্যাপক ও অতি প্রাচীন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা কেবল এই দেশেই প্রচলিত এবং আধুনিক বলিয়াই উহাকে সকলে জানে, সুতরাং বিপরীত অনুমান সঙ্গত হয় না। এক্ষণকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালাঅক্ষর নহে তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার

অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (বোধ হয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ২ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ৰ ও বর্গীয় ব বিভিন্নপ্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখাযায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (র) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।

যাহাহউক সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা বর্ণমালা যুগপৎ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। উপরিভাগে যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে বোধ হয় অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাও ঐ সময়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত কথাই কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা—সুতরাং সেই অনুমানের ব্যাপ্তিগ্রহে যদি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে আমূলতঃ সমুদয়ই মিথ্যা হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধেরা অনুমানকে প্রমাণ বলিয়াই গণ্য করেন

না—সুতরাং অগণ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নিশ্চয় করিতে যাওয়া খুব ভাল কাজ হইল না, বুঝিয়াও উপায়ান্তরা-ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়েও আবার তাহারই অনুসরণ করিতে হইল।

সে বিষয়টী এই—বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হই-য়াছে?—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ইরাণ দেশে (প্রাচীন পারস্যে) এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা ইউরোপে যাইয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক লাটিন, গ্রীক, জর্ম্মন্ প্রভৃতি এবং আসিয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকারে সংস্কৃত ও জেন্দ (প্রাচীন পারস্য) ভাষার উৎপাদন করিয়াছে। উক্ত সমুদয় ভাষাকে এক্ষণে সাধারণতঃ এরিয়ান্ অর্থাৎ আর্য্যভাষা কহে। আর্য্যভাষা সকলের বর্ণমালা, উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, ধাতু, উপসর্গ প্রভৃতির অনেকাংশে চমৎকার-জনক সাদৃশ্য আছে—এরূপ সাদৃশ্য যে, অনেক স্থলে বোধহয় যে, একই কথা কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বলিয়াই কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ শুনায়। প্রফেসর্ বপ্, মাক্স মূলর্, মিউর্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ভূরি২ প্রমাণসহকৃত বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহার প্রামাণ্যার্থ মাদৃশ অদূরদর্শী লোকের বৃথা বাগাড়ম্বর কেবল ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র। অতএব তদ্বিসয়ে বিরত হইয়া কেবল উদাহরণ

স্বরূপ কয়েকটী আর্য্যভাষার একবিধ কথা নিম্নভাগে প্রদর্শন করিলাম।

সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।
প্রথমা	ফ্রাথিমা	প্রোতা	প্রাইমা
দ্বিতীয়া	বিত্যা	দিউতেরা	”
তৃতীয়া	থ্রিত্যা	ত্রিতা	”
ষষ্ঠী	”	হেক্তা	সেক্স্টা
সপ্তমী	হপ্তমা	হেব্দমা	সেপ্তিমা
অহম্	আজেম্	”	”
ত্বম্	তুম্	”	তু
দন্তম্	”	অদন্ত	দেন্তেম্
নক্তম্	”	নক্তম্	নক্তম্
নামন্	নাম	অনমা	নোমেন্
মাতৃ	মাদর্	মাতর্	মাতর্
পিতৃ	পদর্	পাতর্	পাতর্
ভ্রাতৃ	ব্রাদর্	ফ্রাতিয়া	ফ্রাতর্
দুহিতৃ	দোখ্তর্	থুগাতর্	”
দ্বি	দো	দুও	দুও
পঞ্চন্	পঞ্জ	পেন্‌চি	”
দশন্	”	দেকী	দেশেম্
ইত্যাদি	ইত্যাদি		

এই সমস্ত ভাষাকে প্রধানভাষা অথবা ইঙ্গরেজিতে ক্লাসিক্যাল্ ল্যাঙ্গোএজ্ কহে। ইঙ্গরেজি স্বয়ং ক্লাসিক্যাল্ নহে। উহা লাটিন্ গ্রীক্ সাক্সন্ প্রভৃতি নানা ভাষার সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও সংস্কৃতসম শব্দের বহুল অন্তর্নিবেশ আছে—যথা।

সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি	
স্থা	ষ্টে	Stay.
গো	কৌ	Cow.
উক্ষা	অক্স	Ox.
কেন্দ্র	সেণ্ট্র	Centre
ত্রিপদী	ত্রিপদ্	Triped.
হোরা	আউয়ার্	Hour.
মানব	মান্	Man.
নস্	নোস্	Nose.
ত্রিকোণ	ত্রিগণ্	Trigon.
দ্বৈধ	ডাউট্	Doubt.
স্বসৃ	সিষ্টর্	Sister.
দ্বিপদ	বাইপদ্	Biped.
নাভি	নেভেল্	Navel.
নাবী	নেবি	Navy.
নু	নিউ	New.
ঘাস	গ্রাস্	Grass.
উপরি	অপর্	Upper.
দ্বিবাদ	ডিবেট্	Debate

সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি	
রূঢ়	রুড্	Rude.
অন্তর	ইণ্টর্	Inter.
জ্ঞা	(ক্নো) নো	Know
সর্প	সর্পেণ্ট্	Serpent.
অক্ষ	অক্জিল্	Axle.
দ্বার	ডোর্	Door.
মুষা	মৌস্	Mouse.
অন্ত্র	এণ্ট্রেল্স্	Entrails
পথ	পাথ্	Path
উলূক	আউল	Owl.

C. &c

কোরাইওলেনস্, রোমিয়স্, জূলিয়স্, ব্রুটস্ ইত্যাদি স্থলে শেষে যে স্ কার দৃষ্ট হয়, অনেকে কহেন উহা সংস্কৃতের প্রথমাবিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন পদের অন্তভাগের অনুরূপ—অর্থাৎ সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমাবিভক্তির একবচনে স্ কারাগম হয়, যথা রাম শব্দে 'রামস্'; পরে ঐ সকার বিসর্গ হইয়া 'রামঃ' হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে কোরাইওলেন, রোমিয়, জূলিয় ও ব্রুট ইত্যাদি অকারান্ত শব্দই প্রথমে ছিল; পরে উহা প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হইয়া ঐরূপ সকারান্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই প্রথমান্তপদসকলই শব্দরূপে পরিগণিত হইয়াগিয়াছে। যাহাহউক, এ সকল দুর্ব্বিগাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনেকে কহিয়াথাকেন যে, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার জননী—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না—"বোধহয়না" র অর্থ এই যে, বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে। সংস্কৃত গ্রন্থগণের মধ্যে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। বেদের সংস্কৃত দুরূহ, দুরুচ্চার্য্য ও শ্রুতিকটু। শ্রুতিকটু ভাষা সাধারণের প্রীতিকর না হওয়াতে রামায়ণ, সংহিতা, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য ও সুকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। এমন কি পশ্চাদুল্লিখিত গ্রন্থসকলের ভাষা ও বেদের ভাষা এরূপ বিভিন্ন যে, উহাকে যেন একভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। এক্ষণকার প্রচলিত ব্যাকরণসকল ও প্রচলিত সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদের ভাষাবোধে সম্যক্ অধিকারী হওয়াযায়না। প্রাচীন পাণিনীয় ব্যাকরণে বেদভাষাবোধার্থ 'বৈদিকপ্রক্রিয়া' নামে একটী পৃথক্ প্রকরণ আছে। বর্ত্তমানকালে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায় উহা সচরাচর অধীত হয় না এবং আধুনিক ব্যাকরণসমস্তে ঐ ভাগ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুগ্ধবোধকার বোপদেবগোস্বামী সর্ব্বশেষে একটী সূত্র দিয়াছেন—

"বহুলং ব্রহ্মণি"

যদিদং লৌকিকপ্রয়োগব্যুৎপত্তয়ে লক্ষণ মুক্তং তদ্বৈদিক প্রয়োগ-ব্যুৎপত্তৌ বহুলং জ্ঞেয়ং ক্বচিদ্বিহিতং নস্যাৎ, ক্বচিন্নিষিদ্ধং স্যাৎ, ক্বচিদ্বাস্যাৎ ক্বচিত্ততোঽন্যস্যাপীত্যর্থঃ—পূর্ব্বেভিঃ ব্রাহ্মণাস্ ইত্যাদৌ বেদসিদ্ধেঃ।”

‘লৌকিক প্রয়োগ সিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সূত্র কথিত হইল, বৈদিকপ্রয়োগে তত্তৎ সূত্রের অনেক বিপরীত কার্য্যও সম্পাদিত হইবে—অর্থাৎ কোন স্থলে বিহিত কার্য্যও হইবে না—কোন স্থলে নিষিদ্ধ কার্য্যও হইবে—কোন স্থলে বিকল্পে হইবে ইত্যাদি—যথা-পূর্ব্ব শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে ‘পূর্ব্বৈঃ’ না হইয়া ‘পূর্ব্বেভিঃ ; ব্রাহ্মণ শব্দের প্রথমার বহুবচনে ‘ব্রাহ্মণাঃ’ না হইয়া ‘ব্রাহ্মণাস্’ ইত্যাদি—

যাহাহউক ইহা স্পষ্ট বোধহইতেছে যে, অতি দুশ্রব ও দুরুচ্চার্য্য বলিয়া বেদের ভাষা সাধারণের ব্যবহার্য্য হয় নাই এবং এমন কি স্ত্রী শূদ্রাদির যে, বেদপাঠে বা বেদাকর্ণনে অধিকার পর্য্যন্ত নাই, বোধহয় ভাষার কাঠিন্য ও তাহার অন্যতর কারণ হইতেপারে। ফলতঃ বেদের সংস্কৃত কঠিন বলিয়া যেরূপ সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাণাদির কোমল সংস্কৃত সৃষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ উক্ত পুরাণাদির সংস্কৃতও জন সাধারণের দুরুচ্চার্য্য বোধ হওয়াতে উহাহইতেও কোমলতর প্রাকৃতভাষার সৃষ্টি হইয়াথাকিবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধহইবে যে, উক্ত উভয় ভাষা

সর্ব্বাংশে অবিকল একরূপ। অর্থাৎ—ঐ দুই ভাষায়, কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, রচনাপ্রণালী প্রভৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, কেবল স্থানে স্থানে শব্দবিশেষের বর্ণগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্টহয়। যথা প্রতিকূলঃ=পড়িউলঃ; রাজা=রাআ; চন্দ্রম্=চন্দম্; ভবন্তি=হোন্তি ইত্যাদি—

হেমচন্দ্র নামক প্রাচীনপণ্ডিত প্রাকৃত শব্দের এই অর্থ করেন—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

'সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, তাহা হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাকৃত—অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক'। কিন্তু এ অর্থ আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ (Refined) এবং প্রাকৃত শব্দের অর্থ সাধারণ (Common) সংস্কৃত কোন সময়ে স্থল বিশেষে চলিতভাষা ছিল, যদি এরূপ স্থির করাযায়, তাহা হইলে ইহাও স্থির করিতেহইবে—উহা কেবল কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ লোকে উহার সম্যক্ উচ্চারণাদি করিতে পারিত না। প্রাকৃতলোকেরা ঐ সংস্কৃতকে অপভ্রংশিত করিয়া যে ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই 'প্রাকৃত ভাষা' নামে এক ভাষা হইয়া গিয়াছে।

কৃতবিদ্য ও সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে অনেকাংশে

বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যত্র যাইতে হইবে না—আমাদিগের নিজের ভাষা এবং আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের এবং প্রতিবাসী ইতর জাতীয়দিগের ভাষার প্রতি অভিনিবেশসহকারে কর্ণপাত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ সকল ভাষার বাস্তবিক স্বরাদিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে—কেবল সততশ্রবণজন্য অভ্যাসবশতঃ আমাদিগের তাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধহয় না। সংস্কৃত নাটকেও অবিকল এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়—যেখানে রাজা, মন্ত্রী, তপস্বী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুরুষেরা সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, সেই স্থলেই তপস্বিনীভিন্ন স্ত্রীজাতি ও ভৃত্যপ্রভৃতি সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব পদোচিত প্রাকৃতভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখমাত্রও নাই। ইহাতে বোধহয় তৎকালে উহার সৃষ্টিই হয় নাই। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, উহার সৃষ্টি ও ক্রমশঃ প্রবলরূপে প্রচলন আরম্ভ হইলে উহার ব্যাকরণেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। বররুচি, শাকল্য, ভরত, কোহল, বৎসরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাকৃতব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি-কৃত ‘ প্রাকৃতপ্রকাশ ’কেই সর্ব্ব প্রথম প্রাকৃতব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

যেরূপ প্রসিদ্ধি তাহাতে বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৩০ বৎসর হইল। সুতরাং প্রাকৃতপ্রকাশ যদি ঐ সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার অন্ততঃ ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রাকৃতভাষার সবিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। খৃষ্টের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজার অধিকারকালে এণ্টিওকস্ প্রভৃতি যে গ্রীক্ রাজাদিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ভাষাও একপ্রকার প্রাকৃত—সুতরাং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান হইতেপারে যে, তৎকালে প্রাকৃতভাষাই দেশমধ্যে চলিত ভাষা ছিল, এবং তাহা হইলেই উহা যে, প্রদেশভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহা বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র যে, অর্দ্ধমাগধী বা পালীভাষায় লিখিত, উহাও একপ্রকার প্রাকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ ভাষা প্রথমে পল্লীগ্রামের লোককর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, এজন্য উহার নাম পালী হইয়াছে।

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ। সংস্কৃতে ষত্ব ণত্বের যে প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে, প্রাকৃতে সে গোলযোগ কিছুমাত্র নাই—প্রাকৃতে সর্ব্বস্থলেই (সাধারণতঃ) এক দন্ত্য সকার, এক মূর্দ্ধন্য ণকার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আধুনিক অপরাপর ভাষার ন্যায়

প্রাকৃতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, কেবল একবচন ও বহুবচন। ইহার রচনাপ্রণালীও যে সহজতর, তাহা মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন—

দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥

কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ।

'সরস্বতী দুইপ্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্ব্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধন অর্থাৎ প্রাকৃতদ্বারা পার্ব্বতীর।'

সে যাহাহউক, এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রাকৃতভাষাই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন—কিন্তু মাতামহী। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কঠিন ও দুশ্রব ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, এই জন্য সেই ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতাসম্পাদন করায় ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে। ঐ শিথিলতাকরণ দুইপ্রকারে সম্পন্ন হয়—এক প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়প্রকার বিপ্রকর্ষণ। নদ্যাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং 'ধর্ম্ম' শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরুচ্চার্য্য ভাষার সুখোচ্চার্য্যতা সম্পাদিত

হয়—নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়ে অনেক স্থলেই যে, সেই ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
অহম্	অহম্মি	আমি
লবণ	লোণ	লূন
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
শ্মশান	মসাণ	মশান
গৃহ	ঘর	ঘর
স্তম্ভ	খম্ভ	থাম্বা
চক্র	চক্ক	চাক বা চাকা
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
বৎস	বচ্ছ	বাছা
কার্ষাপণ	কাহাবণ	কাহণ
হস্ত	হত্থ	হাত
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
বহিঃ	বাহির	বাহির
বধূ	বহু	বৌ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ্
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুড়া
জ্যেষ্ঠ	জেট্ঠ	জেঠা
ভক্ত	ভত্ত	ভাৎ
স্নান	হ্নাণ	নাহা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ্
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা
যষ্টি	লট্ঠী	লাঠী

ইত্যাদি।

ভাষার পরিবর্ত্তসময়ে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ কার্য্যই কেবল হইয়াথাকে তাহা নহে, অনেক স্থলে নূতন বর্ণের আগম—কোন স্থলে বর্ণবিশেষের লোপ এবং স্থলবিশেষে কোন কোন বর্ণের অন্যথাভাবও হইয়া থাকে। উপরিপ্রদর্শিত শব্দসকল মধ্যেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালী-বিদ্ধ নিয়মপদ্ধতি পাওয়াযায়, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়াযায় না। সুতরাং কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, তাহা নিরূপণকরা অতি দুরূহ ব্যাপার। বোধ-

হয় কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাঙ্গালার উপাদান নহে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও সে কথা কহিয়াথাকেন যথা—

বাচোযত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তর মুচ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচন।

"যেদেশে ভাষার বিভিন্নতা হয়—গিরি বা মহানদী যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহা যায়।" সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশে কোনরূপ প্রাকৃতভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় তৎকালে এদেশের জন-সাধারণের ব্যবহারার্থ কোন এক আদিমভাষা ছিল। সেই ভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হইয়া এই বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্যাপি এই ভাষায় ঢেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, তাহারা না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারসী, না আরবী। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার ক্রিয়া কারক বিভক্তি প্রভৃতি এপ্রকার ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভুত, একথা বলিতে পারা যায় না—অবশ্যই ভাষান্তরসহকৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্বীকারকরিতে হয়। এক ভাষা হইতে কিরূপে ও কি প্রণালীতে ভাষান্তরের সৃষ্টি হয়, তাহা নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার খুব প্রাচীন গ্রন্থ একখানিও পাওয়া

যায় না। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকাল হইতে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া সাধারণের পরমশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছে। সংস্কৃতভিন্ন অপর ভাষাকে লোকে কেবল ব্যবহারিক ভাষা বলিয়া বোধকরিত; বিদ্যানুশীলনও পূর্ব্বে সাধারণতঃ এরূপ প্রবলপ্রচার ছিল না। সুতরাং যাঁহারা তৎকালে কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিতেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদিরচনা করিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য জন্মিত, তাঁহারা সেই শক্তি সংস্কৃত-গ্রন্থরচনে প্রয়োজিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন; সুতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বহুকালপর্য্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুরবস্থা ছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী ও জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালার খুব প্রাচীন পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহাও ৩। ৪ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের নহে; সুতরাং তদ্দারা ভাষার মূলানুসন্ধান হওয়া অসম্ভব। যাহাহউক ওরূপ অশক্য ব্যাপারে অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার ক্রিয়া কারকাদি যেরূপে প্রযুক্ত হয় এবং তাহারা যেরূপে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, কেবল তদ্বিষয়ের কয়েকটী স্থূল স্থূল কথা বলিয়া আমরা এপ্রকরণ পরিত্যাগ করিব।

সন্ধি—সংস্কৃতে যেরূপ পদদ্বয়ের অন্ত্য ও আদ্যবর্ণের পরস্পর মিলন হইয়া সন্ধি হয়, বাঙ্গালাতেও অবিকল সেইরূপ সন্ধির ব্যবহার আছে; সুতরাং এ অংশে বাঙ্গালা

সংস্কৃতের সম্পূর্ণরূপ অনুকারক। তবে কোন কোন প্রয়োক্তা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করেন না এবং তাহা না করাতেও বিশেষ দোষ হয় না।

সমাস—সমাসও সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ—সংস্কৃতে যে শব্দ যেলিঙ্গ, বাঙ্গালাতেও সেই শব্দকে সেইলিঙ্গ বলিয়াই ব্যবহার করাহইতেছে। তবে যে স্থলে শুনিতে কদর্য্যবোধ হয়, কেবল সেই স্থলেই লিঙ্গসূচক চিহ্নাদি দেওয়া হয় না।

কারক ও বিভক্তি—সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ এই ছয় কারক ও সম্বন্ধপদ আছে এবং সেই সকল স্থলে যথাযথ প্রথমাদি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াথাকে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই, কেবল একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ হইয়াথাকে। এই সকল বিভক্তির আকার কিছু ভিন্নরূপ। কর্ত্তায় 'রা' 'এরা' কর্ম্মে 'কে' 'দিগকে' করণে 'দ্বারা' 'দিয়া' অপদানে 'হইতে' অধিকরণে 'তে' ও সম্বন্ধে 'র' 'এর' 'দিগের' প্রভৃতি যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিভক্তির চিহ্ন যে, কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির বলাযায় না।

ধাতু ও ক্রিয়া—বাঙ্গালায় যে সকল ক্রিয়াপদ দেখিতে পাওয়াযায়, তাহার ধাতুসকল প্রায়সমস্তই সংস্কৃত-মূলক। সেই সংস্কৃত ধাতুহইতে প্রাকৃতভাষায় যে ক্রিয়া জন্মে, সেই

ক্রিয়া অপভ্রংশিত হইয়া বাঙ্গালাক্রিয়াপদের উৎপাদন করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করাযায়। ইহার প্রামাণ্যার্থ প্রথমতঃ কয়েকটী সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ প্রদর্শন করা যাউক।—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা—ক্রিয়া
ভবতি	হোই	হয়
করোতি	করই	করে
বক্তি	বোলই	বলে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে
স্মরতি	সুমরদি	সুমরে
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
কথয়তি	কহই	কহে
অস্তি	অচ্ছি	আছে
ক্ষিপতি	ফেলদি	ফেলে
পঠতি	পঢ়ই	পঢ়ে
পততি	পড়ই	পড়ে
মৃদ্নাতি	মলদি	মলে

ইত্যাদি।—

উপরিপ্রদর্শিত পদগুলির প্রতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধহইবে যে, 'হোই' প্রভৃতি প্রাকৃত ক্রিয়া হইতেই 'হয়' প্রভৃতি বাঙ্গালাক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের বোধহয় যে 'হইতেছে' প্রভৃতিক্রিয়া একমাত্র ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু ভূ ও অস এই উভয় ধাতুর যোগে উৎপন্ন। অস ধাতুর সংস্কৃত ক্রিয়া 'অস্তি' হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় 'আছে' হইয়াছে। পরে ভূ ধাতুর অসমাপিকাক্রিয়া 'হইতে' ও অস ধাতুর সমাপিকাক্রিয়া 'আছে' এই দুই ক্রিয়া একত্র মিলিত হইয়া ও 'আছে' র আকারের লোপ হইয়া 'হইতেছে' ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 'দেখিতেছে' 'করিতেছে' 'কিনিতেছে' এবং 'হইয়াছে' 'দেখিয়াছে' 'করিয়াছে' ইত্যাদি স্থলেও বোধ হয় ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াথাকিবে। অস ধাতুর অতীতকালিকা সংস্কৃতক্রিয়া 'আসীৎ' হইতে বোধহয় বাঙ্গালায় 'আছিল' ক্রিয়া জন্মিয়াছে। কিছু প্রাচীন পুস্তকে 'আছিল' ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা—

'যখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার' (জীবগোস্বামীর করচা)।

'আছিল দেউল এক পর্ব্বতপ্রমাণ' (শুভঙ্করের আর্য্যা)।

এক্ষণে আর 'আছিল' ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'ছিল' হইয়াছে। যাহাহউক, বোধহয় 'হইয়া' ও 'আছিল' এই দুইক্রিয়ার যোগে 'হইয়াছিল' ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াথাকিবে। 'করিয়াছিল' 'দেখিয়াছিল' প্রভৃতি স্থলে এবং 'হইতেছিল' 'করিতেছিল' ইত্যাদি স্থলেও ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে বলাযাইতেপারে। 'হউক' 'করিল' 'দেখিবে' 'কিনিতাম' ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল

ক্রিয়াপদ আছে, তৎসমস্তের মূলাকর্ষণ করিতে পারা যাউক বা না যাউক কিন্তু সকলই যে, ঐরূপ সংস্কৃতমূলক কোন না কোন ধাতু বা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র সমাপিকাক্রিয়া কিছু কম আছে। অনেক স্থলে ভাবক্রিয়াকে কর্ম্মপদ ও কৃ ধাতুর ক্রিয়াকে সমাপিকাক্রিয়াপদ করিয়া বাক্য নিষ্পন্ন করা যায়। যথা গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিয়াছে, ক্রীড়া করিয়াছিল, বধ করিব ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এইরূপ অপর্য্যাপ্ততা ভাষার পক্ষে সুবিধা নহে। বাঙ্গালার এই অসুবিধা অনেকেই সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে 'হইতে' 'হইয়া' প্রভৃতি যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে বোধহয় 'হইতে' নিমিত্তার্থক তুমন্ত 'ভবিতুং' বা 'হোতুং' হইতে এবং 'হইয়া' অনন্তরার্থক ক্ত্বাজন্ত 'ভূত্বা' বা 'ভবিঅ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখিতে, দেখিয়া ; করিতে, করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াকেও ঐরূপে উৎপন্ন বলাযাইতেপারে। বিশেষতঃ ক্ত্বাজন্ত পদগুলির প্রাকৃত যাহা হয়, অনেক স্থলেই তাহা হইতে বাঙ্গালাকরা (প্রধানতঃ) কেবল এক আকারযোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা করিঅ—করিয়া, মিলিঅ —মিলিয়া, শুনিঅ—শুনিয়া, ভণিঅ—ভণিয়া ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা গেল, তদ্দারা

ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, অথবা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করাগিয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ; কিন্তু প্রাকৃতের উপাদান উপকরণ প্রভৃতি সমুদয়ই সংস্কৃত, সুতরাং বাঙ্গালাও পরম্পরা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত-মূলক। ইহা যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ক্রমে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাও সঙ্ক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল। পরে কালক্রমে ইহার যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও যথাযোগ্য স্থলে ক্রমশঃ উল্লেখ করিবার চেষ্টা করাযাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল অর্থাৎ বল্লাল বা লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সময় অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেও বাঙ্গালাভাষার উপত্তি ও প্রচার আরম্ভ হইযাছে। সজীব প্রাণীমাত্রেই জন্মলাভকালে যদবস্থ থাকে, বয়স হইলে কখনই তদবস্থ থাকে না। আমরা যৎকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আমাদিগের তাৎকালিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর পৃথগ্বিধ হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিতে গেলে

বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভাষা যদিও স্বয়ং সজীব প্রাণী নহে, কিন্তু সজীবপ্রাণীর সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ যে অন্তঃকরণ, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি, সজীবপ্রাণীর বাগিন্দ্রিয়েই ইহার চিরনিবাস এবং ইহা সজীবপ্রাণীকে নিয়ত পরিচালনকরিবার যন্ত্রস্বরূপ; সুতরাং ইহারও কৌমার, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা যে, একভাবেই যাইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া এদেশের যে ভাষা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অত্রত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা আজিও যে, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেছি, তাহা কখনই নহে। কিন্তু সেই ভাষাই না হউক ভিন্ন ভাষাও নহে—যদি রামচন্দ্রনামক কোন দুইবর্ষবয়স্ক বালককে আমরা কিয়দ্দিন দেখিয়া তৎপরে একেবারে বিংশতিবৎসর পরে তাহাকে আবার দর্শনকরি, তাহা হইলে কখনই সেই রামচন্দ্র বলিয়া প্রথমে চিনিতে পারিনা—কিন্তু চিনিতে পারিনা বলিয়াই যে, সে ব্যক্তি সেই রামচন্দ্র নহে, তাহাও বলিতে পারাযায় না; কারণ সেইরামচন্দ্রনিষ্ঠ কতকটা অনন্যসাধারণ পদার্থ সর্ব্বক্ষণই তাহাতে বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আমাদিগের কান্যকুব্জাগত পূর্ব্বপুরুষেরা যদি এই সময়ে একবার গাত্রোত্থান করিয়া উঠেন, তাহাহইলে তাঁহারা প্রথমতঃ আমাদিগের এই চলিত ভাষাকে অন্যবিধ ভাষা বলিয়াই

বোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ অনুশীলন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের সেই পূর্ব্ব-ব্যবহৃত ভাষাই—অন্য কিছু নহে; তবে সেই ভাষার শরীরে অনেকটা পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে এইমাত্র—মূল প্রকৃতির কিছু-মাত্র বিপর্য্যয় হয় নাই। জগতীস্থ সমস্ত বস্তুর ন্যায় ভাষাও নিয়ত পরিবর্ত্তশীল। সেইপরিবর্ত্তের অবস্থা বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামে অভিহিত হইয়াথাকে।

বাঙ্গালার উৎপত্তিকাল হইতে অদ্যপর্য্যন্ত সময়কে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশকরা অসঙ্গত বোধহয়না। আমা-দিগের বিবেচনায় প্রথম হইতে চৈতন্যচন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শক [১৪৮৫ খৃষ্ট অব্দ] পর্য্যন্ত এই সময়কে আদ্যকাল; তৎপরে চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্ররায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬৭৪ শক [১৭৫২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত সময়কে মধ্যকাল এবং তৎপরে ভারত-চন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তনকাল বলা সঙ্গত হইতে পারে। ঐ তিনকালের বাঙ্গালা-ভাষার অবস্থা যথাক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারাযায়। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ বাঙ্গা-লার সেই বাল্যাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আদ্যকাল

কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারেনা। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, এ সকল কথা অন্য কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারিতাম না। ভাষার পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষা প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহা বলিয়া দিবার লোক অর্থাৎ তাহা বলিয়া দিতেপারে এরূপ ইতিহাস কিছুই পাওয়াযায়না। সুতরাং কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ওবিষয়ে যাহা কিছু বলাযাইতে পারে। যদি ঐ সময়ের লিখিত ২। ৪ খানি গ্রন্থ পাওয়া যাইত, তাহাহইলে ঐ অনুমান কিয়ৎপরিমাণে সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আমরা যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—দেখিতেছি, সে সমস্তই প্রায় চৈতন্যদেবের উৎপত্তির পরকালীন গ্রন্থ—পূর্ব্বকালীন নহে। কেবল বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি গীতই চৈতন্যের পূর্ব্বকালে বিরচিত বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। যেহেতু বৈষ্ণবদাসসঙ্কলিত পদকল্পতরুনামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতাবলি শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন যথা—

জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিলভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥ (পদকল্পতরু ১৫)

যাহাহউক এই দুই জনকে লইয়া এবং ইহাঁদিগের রচনার উপরেই নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রথমাবস্থার বিষয় নিঃশেষিত করিতে হইল, তদ্ব্যতিরেকে ঐ সময়ের আর কোন গ্রন্থই পাওয়াগেল না।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতিবিরচিত কোন পৃথক্ গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই, কেবল পদামৃতসমুদ্র, পদাবলী, পদকল্পতরু, প্রাচীনপদাবলী প্রভৃতি বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক গ্রন্থে তাঁহার ভণিতিযুক্ত গীতসকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল গীতের সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প নহে, সুতরাং বোধহয় তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ অবশ্য ছিল।

বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় সংবাদ বলিতে পারাযায়না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি চৈতন্যের শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে, চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং বিদ্যাপতি ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খৃঃ অব্দে) অথবা তৎসন্নিহিত সময়ে অবস্থিত ছিলেন বলিতে হইবে।—

" কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমানে " ॥ (প, ক, ত, ২৬৫)।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা"। (প, ক, ত, ২৮৩)

এই সকল তাঁহার রচিত পদাবলীতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র বোধ হয় যে, তিনি শিবসিংহনামক কোন রাজার অধিকারমধ্যে অথবা তাঁহার সভাসদ্‌রূপে অবস্থিত ছিলেন। শিবসিংহের রাজমহিষীর নাম লছিমা বা লক্ষ্মীদেবী। বিদ্যাপতির সময়ে মুসলমানদিগের রাজ্য ছিল—সুতরাং শিবসিংহ যে, কোন দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাহা বোধহয়না। বীরভূম বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ইহার অন্যতম কোন প্রদেশের একজন বড় জমীদার ছিলেন, ইহাই বোধহয় এবং সেইজন্যই কোন ইতিহাসে তাঁহার নাম পাওয়াযায়না। ইহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয়না। যাহাহউক এস্থলে ইহাও প্রকাশকরা আবশ্যক যে, বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাপতির বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ঐ প্রদেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লোকপরম্পরায় এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাত্‌না প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। রাজমহিষী

লছিমাদেবীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল এবং ঐ মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভাত হইত, এই জন্য তিনি লছিমার নামেই ভণিতি দিয়া কবিতারচনা করিতেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলা যায়না। যাহাহউক বিদ্যপতির গীতে যে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথের নামোল্লেখ পাওয়াযায়, বোধহয় ইহাঁরা তাঁহার প্রিয় মিত্র ছিলেন।

বিদ্যাপতির রচনাদর্শনে বোধহয়, তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃত জানিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার অনেক পদ সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে দেখিতেপাওয়াযায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে একটী উদ্ধৃত করা গেল—

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দূরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীলপটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলিক কমল ইহ না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

এই গীতটী জয়দেবের নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবকেই বিপর্য্যস্তরূপে লইয়া যে,গ্রথিত তাহাতে বোধহয়, কাহারও সন্দেহ হইবে না—

হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥

বিদ্যাপতি, পদাবলীতে নিজ জাতিনির্দ্দেশ না করিলেও তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতাদর্শনেই একপ্রকার স্থির করিতে পারাযায় যে, তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণভিন্ন আর কেহই প্রায় সংস্কৃত জানিতেন না। বিদ্যাপতির গীত সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত। অন্যবিষয়ক তাঁহার কোন গীতাদি আছে কি না তাহা বলিতে পারাযায় না। বিদ্যাপতির নামসম্বলিত 'পুরুষপরীক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়। আমাদিগের বোধ হয়, উহা উক্ত রাজা শিবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে বিরচিত হইয়াছিল—এক্ষণকার কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ কহেন তাহা নহে, বিদ্যাপতিই ঐ পুস্তক বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গদ্যরচনার অসম্ভাবিতা ও ভাষাগতবিলক্ষণতা বিবেচনাকরিয়া সে কথায় আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস হয়না। বিদ্যাপতির অনেক গীতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির চিহ্ন পাওয়াযায়। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাবগভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সমগ্র-ভাবে অর্থপরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণবিবরে যেন মধুধারা বর্ষণ করে। এই পুস্তকেরই স্থানে স্থানে যেসকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই একথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে।

চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসেরও পৃথক্ কোন গ্রন্থ

দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখিতেপাওয়াযায়। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—'নান্নুর' নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুল্লী-পুর থানার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ঐ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্যদেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী; অপভাষায় ইহাঁকে বাশুলী বলে। প্রসিদ্ধি আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে ইহাঁর উপাসনা করিতেন, পরে ইহাঁরই উপদেশে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হয়েন, এবং তদ্বিষয়ক নানা পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদাবলীতে এই বৃত্তা-ন্তের কতক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কি মোহনী জান বন্ধু কি মোহনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥

(প, ক, ত, ৮১৮)।

তথা—* * নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,—ইত্যাদি (প, ক, ত,৮৯১)॥

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই বলাযাইতেপারে যে, চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির জন্মপরিগ্রহবিষয়ক অনুমান যদি স্থির হয়, তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতেহইবে। কারণ উহাঁরা দুইজনেই একসময়ে অবস্থিত ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গীতেও উহাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব্ চণ্ডীদাসগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল, সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিগেল॥
চণ্ডীদাস তব্ রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গায়ত দুহুঁহিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহ নামশ্রবণে তহিঁ জানল রূপনারায়ণ গোই॥ (প,ক,ত,২৪১০)
তথা—ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥ (ঐ ২৪১২)

ঐ সাক্ষাৎকারসময়ে উভয়ের কবিত্ব রসিকত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতির প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহাঁদের সাক্ষাৎকারবিষয়ক উপাখ্যান কাল্পনিক বলিয়া বোধহয়না।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়াযায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক্‌পত্নী প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্যস্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাব-গাম্ভীর্য্য ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহাঁর গীতে সেরূপ অতি কম পাওয়াযায়। ইহাঁর রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক—বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধহয়না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনাকরিতেহইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐরূপ ছন্দোবন্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক-পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তিসম্ভূত বলিয়া বোধহয়। তাঁহার রচিত যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে তৎপাঠেই পাঠকেরা এবিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা যে, খুব প্রাচীন তদ্বি-ষয়ে কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার আদি-রচনা—অর্থাৎ আদ্যকালে এইদুইজন ভিন্ন আর কেহই কোন বিষয়ে কোন রচনা করেন নাই—"তাহা বলিতে পারা

যায় না; প্রত্যুত ইহাঁদিগের রচনাতে যেরূপ কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহাঁদেরও পূর্ব্বে যে, বাঙ্গালা রচনার কিছু অনুশীলন ছিল, কেহ কেহ কোন বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন—কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে, অথবা অদ্যাপি স্থানেস্থানে আছে, আমরাই তাহার সন্ধান জানিতে পারিনাই, ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।

যাহাহউক আদ্যকালে গদ্যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। এই পুস্তকের ২৮পৃষ্ঠে উদ্ধৃত ১৫ সঙ্খ্যক পদে উল্লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গদ্যময়ও গীত রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু সে গদ্য কখনও দেখাযায় নাই এবং গদ্যময় গীত কিরূপ হইতেপারে, তাহাও বুঝিতেপারাযায়না; এই জন্য ওলেখার উপরে আস্থা হইতেছে না। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধহয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীসদেশে লিনস্ অর্ফিয়স্ মিউজিয়স্ হোমর এবং ইটালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্ এণ্ড্রোমিকস্ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতেও বেদ* সংহিতা রামায়ণ

* বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন স্বরের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীতগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।

প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে যে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্তবিনোদনার্থ স্বরসংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপণকরে। ঐ সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকালপর্য্যন্ত জনগণের রসনাবাসীই থাকে। পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্ হোমরাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐ রূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইবে, তাহাই সম্ভবপর বোধহয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে যে যে বাঙ্গালাগ্রন্থ অবলোকন করিলাম, তাহাতে আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াউঠিল যে, বীরভূম বাঙ্কুড়া ও বর্দ্ধমান এই তিন প্রদেশেই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল। কারণ, দেখাযাইতেছে যে, এক কৃত্তিবাস ভিন্ন প্রায় সমস্ত প্রাচীন কবিই উক্ত তিন প্রদেশের অন্যতমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবং অদ্যাপি ঐ সকল প্রদেশেই রামায়ণ ও চণ্ডীর গায়ক এবং সঙ্কীর্ত্তনকারী অধিক দেখিতেপাওয়াযায়। অতএব দেখ, এক্ষণে আমরা যাঁহাদিগকে 'রেঢ়ো' লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াথাকি, তাঁহারাই একসময়ে অসামান্য

রসিকতা ও সহৃদয়তার আধার ছিলেন, তাঁহারাই আপন আপন চিত্তক্ষেত্রে বাঙ্গালাকাব্যবৃক্ষের বীজ প্রথমে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই নিকট বাঙ্গালাভাষা এত দূর ঋণী আছে এবং তাঁহাদিগেরই দোহাই দেওয়াতে অনেক দিনের সভ্য জাতি বলিয়া লোকের নিকট আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইতেছে!।

এক্ষণে আদ্যকালে ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়াদেখা আবশ্যক। বিদ্যাপতির যে কয়েকটী গীত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে, ও নিম্নে যে—

সখি কি পুচ্ছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতিঅনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক॥

প্রাচীন পদাবলী।

এই গীতটী উদ্ধৃত হইল ইহাতে—এবং তৎপ্রণীত এই রূপ অপরাপর গীতে নয়নপাত করিলেই আপাততঃ বিলক্ষণ এই প্রতীতি জন্মিবে (এবং অনেকের তাহাই জন্মিয়াছে) যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাভাষা হিন্দির সহিত অত্যন্ত মিশ্রিত ছিল—অন্যথা বাঙ্গালাগীতে হাম্, কৈছন, মোয়,

সোই, ঐছে ইত্যাদি ভূরি ভূরি হিন্দিশব্দ এবং হিন্দির ন্যায় বাঁকা বাঁকা ক্রিয়া কেন রহিল? কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচনাকরিতেহইবে যে, বিদ্যাপতিরচিত গীতে যেরূপ হিন্দিমিশ্রণ আছে, যদি ঐ সময়ের দেশভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে তৎকালে যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তৎসমস্তেই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রণ থাকিত—কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাঁরা সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এবং নিম্নে উদ্ধৃত—

> তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
> তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
> শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
> ভরমে তোমার রূপ ধরণিতে লিখি॥
> গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
> পর সঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
> পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
> তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥
> নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
> চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ (প, ক, ত, ৭৮৬)

এই গীতে এবং এইরূপ সকল গীতেই হিন্দির ভাগ প্রায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অতএব বিবেচনা কর যে, যদি ঐ সময়ের ভাষাই ওরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত,

তাহা হইলে সমসাময়িক দুই কবির রচনা কখনও এরূপ বিসদৃশ হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতিরও কোন কোন গীতে হিন্দির অংশ নাই—চণ্ডীদাসেরও ২।১টী গীতে হিন্দির অংশ বিলক্ষণ আছে এবং ইহাঁদিগের শতাধিকবৎসরপরবর্ত্তী গোবিন্দদাসপ্রভৃতির প্রায়সমস্ত গীতেই বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অধিক হিন্দি আছে। নিম্নোদ্ধৃত গীত সকলে ইহা সপ্রমাণ হইবে—

"রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুক তুমি গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম্ কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই"॥ (প, ক, ত, ৬৭১)

**** "তুহু একে রমণীশিরোমনি রসবতী কোন্ ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে শ্যামসঞে বিলসব কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরীবচন শ্রবণ ধরি সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষত হাসি মনে মান তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোঁহা হেরি॥
*** দ্বিজ চণ্ডীদাস আবির জোগায়ত সকল সখীগণ সাথে"॥ঐ ১৪৮৮।

"কাহে পুন, গৌরকিশোর।
অবনতমাথে লিখই মহীমণ্ডল নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥

কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগরে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন পানিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাস॥
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস”(ঐ ১৮৩৩)।

অতএব এস্থলে বিবেচনা করিতেহইবে যে, এক সময়ের দুইজন কবির মধ্যে একের অধিকাংশ রচনাতেই হিন্দির অত্যন্ত মিশ্রণ কিন্তু কোন কোন রচনাতে প্রায় কিছুই নাই এবং দ্বিতীয়ের সমস্ত রচনাতেই হিন্দির সংস্রব প্রায় কিছুই নাই কিন্তু কোন কোনটীতে বিলক্ষণ আছে, সুতরাং ইহাদ্বারা ঐ সময়ের দেশভাষাই যে, ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্তকরা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়না। তবে উক্ত কবিদ্বয়ের ওরূপ বিসদৃশ রচনা কেন হইল? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা বা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি যে, যেসকল রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিচার করাযাইতেছে, তৎসমস্তই রাধা কৃষ্ণের লীলাবর্ণনবিষয়ক সংগীত। বোধহয় উক্তরূপ সংগীত প্রথমে বৃন্দাবনের সন্নিহিত স্থানে এবং ব্রজ-ভাষাতেই বিরচিত হইয়াথাকিবে। বাঙ্গালাকবিগণ তাহা হইতেই ঐ প্রথা প্রথমে শিক্ষাকরেন এবং শিক্ষা করিয়া, যাঁহাদিগের ঐ ভাষা নিতান্ত মধুর বলিয়া বোধহয়, তাঁহারা ঐ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, কিছু দুর্ব্বোধ হইলেও ঐ ভাষার অনেক ক্রিয়া কারকাদি স্বদেশীয়ভাষার সংগীত-মধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ আবার

মাধুর্য্যবোধসত্ত্বেও কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া তদ্‌গ্রহণে তত যত্ন করেন নাই। অতএব গীতমধ্যে ব্রজভাষার শব্দগ্রহণ ঐচ্ছিক হওয়াতে এবং প্রত্যেক লোকেরই রুচি বিভিন্ন-প্রকার হওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা ওরূপ বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত গীতাবলীতে যে সকল হিন্দিসম শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল হিন্দিই নহে; উহার কতক খাটী প্রাকৃত ও কতক ব্রজভাষা—অথবা তাহা-দেরই কোনরূপ অপভ্রংশ। দহসি, পারই, পুচ্ছসি, ধারই, হম্‌, সো, তুহ ইত্যাদি শব্দত অবিকল প্রাকৃত এবং ঐছন, যৈছন, তৈছন, কৈছন, হিয়া, ঈসা, যীসা, তীসা, কীসা, কাহে, ইত্যাদি শব্দ প্রাকৃতের অপভ্রংশ। তদ্ভিন্ন যাকর, কতিহুঁ, মোতিম, ভেল, রহই, চললহি, পন্থহি, গায়ত, পাওল, নখই, তহি, জানল, করল, ভাসল, নিহারনু, রাখনু, কাহু, না পেখ, তুহু, জগমাহ, বিলসব, জোগায়ত, জনু, লিখত—ইত্যাদি পদ সকলের একটীও খাটী হিন্দি নহে; বোধহয় এগুলি ব্রজভাষা হইবে। তবে এক্ষণকার কাহারও২ মতে হিন্দি ও ব্রজভাষা একই—অথবা ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর নিতান্তসম্পৃক্ত—হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষা তাহাহইতে স্বতন্ত্র। যদি এ মত গ্রাহ্য করাযায়, তাহাহইলে পূর্ব্বো-ল্লিখিত ব্রজভাষার শব্দ সকলকে হিন্দি বলিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। যাহাহউক ইহা দেখাযাইতেছে

যে, কৃষ্ণচরিতবর্ণনে ব্রজভাষামিশ্রিত রচনাই অনেকের অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধহয় ব্রজভাষার মাধুর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে, পবিত্রতাবোধও কিছু কারণ হইতেপারে। যে সকল কৃষ্ণপরায়ণ ভক্তেরা পরম পবিত্রবোধে ব্রজের মৃত্তিকাপর্য্যন্ত ভক্ষণকরিয়াথাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে ওরূপ সমাদরকরা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যে গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার শব্দ অনেক আছে। গোবিন্দ-দাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহনদাস, কবিশেখর, রামানন্দ, প্রভৃতি যে সকল কবিগণ সঙ্গীতরচনা করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের রচনাতেও ব্রজভাষার কথা অনেক আছে—কিন্তু সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকটসময়ে চৈতন্যচরিতা-মৃত, চৈতন্যভাগবত, জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি, সঙ্গীত-ময় নহে এরূপ, যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির সময়েও কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজভাষা বা হিন্দির সংস্রব যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারণভাষাতে সেরূপ ছিলনা। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাষার সংস্রব কিছুমাত্র নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সে সময়েরও ২। ১ জন কবি, যখন্ সাধ করিয়া ব্রজভাষামিশ্রিত গীত লিখিতে-

গিয়াছেন, তখন্ ওবিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই। সে গীত এই—

"যতহুঁ নিরখত, অতহুঁ বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে"

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

"কাহে, সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র।

তবে এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করাযাইতেছে না যে, আমরা যাহাকে আদ্যকাল বলিতেছি তখন্ যেরূপ বাঙ্গালা ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ বাঙ্গালাই আছে। তাহা কখনও হইতে পারে না। যেমন আকরোত্থিত অসংস্কৃত বস্তুর গাত্র নিরীক্ষণকরিলে তাহাতে তদাকরিক অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ লক্ষিত হয়, সেইরূপ আদ্যকালের বাঙ্গালাতে তদাকরীভূত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অধিকসংস্রব লক্ষিতহইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। এইজন্যই পুচ্ছসি দহসি, করই হসই, বোলে, ইত্যাদি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ক্রিয়ার যোগ প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক দেখাযায়। ঐ সকল ক্রিয়া বোধহয় ব্রজভাষার নহে।

বাঙ্গালাভাষায় এক্ষণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত আদ্যকালের বাঙ্গালাতেও রজনীপ্রভাত, মৃগমদসার, নবজলধর, বন্দী, ধরণী, গুরুজন, মধুযামিনী, পুলক ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ

সকলই অধিকব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় সমাসঘটিত বড় বড় কথা ব্যবহৃত হইত না। বিশেষণও এক্ষণকার ন্যায়ই তখনও প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বিনিবেশিত হইত। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে তাহাতে যে, স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-আ দিতেইহইবে, এরূপ কোন নিয়ম ছিলনা—মধুরতা ও শ্রুতিকটুতার অনুরোধে রচয়িতার ইচ্ছামতই প্রদত্ত হইত। ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ ছিলনা—সুতরাং রচয়িতাদিগকে ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে হইত না। বাঙ্গালা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও সংস্কৃত মহামাহাত্ম্যশালী বলিয়া ক্রমশঃ উহারই অনুসরণ বাঙ্গালায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংস্কৃতের বাক্যবিন্যাসপ্রণালী যেরূপ, বাঙ্গালারচয়িতারা ক্রমেক্রমে সেইরূপই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধিক কি আদ্যকালের যে সকল গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতেপারিয়াছি—তাহাদের রচনার সহিত এক্ষণকার রচনার আত্যন্তিকী বিভিন্নতা লক্ষিত হয়না। তবে স্থল বিশেষে ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, কারক, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম প্রভৃতিতে স্পষ্টপ্রাচীনতা দেখাযায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাৎকালিকভাষায় প্রাকৃত হিন্দি বা ব্রজভাষা ততদূর মিশ্রিত না থাকুক কিন্তু অল্পমিশ্রিত ছিল, তাহা বেশ বোধহয়। তদ্ভিন্ন আর একটীকার্য্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়।—সংযুক্ত

বর্ণের বিশ্লেষকরণরূপ বিপ্রকর্ষণকার্য্য আধুনিকপদ্যেও অনেক আছে বটে, কিন্তু প্রাচীনপদ্যে ঐ কার্য্যের অত্যন্ত আধিক্য অনুভূত হয়। সেই বিপ্রকর্ষণকার্য্য এইরূপ— মূর্ত্তি=মূরতি, নির্ম্মল=নিরমল, নির্ব্বাহ=নিরবাহ, ধর্ম্ম= ধরম, কর্ম্ম=করম, প্রমাণ=পরমাণ, লক্ষ্মী=লছিমা, ভস্ম=ভসম, প্রীতি=পিরীতি, দর্শন=দরশন, তৃপ্ত= তিরপিত, স্পর্শ=পরস, ভ্রম=ভরম, প্রসঙ্গ=পরসঙ্গ, দ্রবে=দরবয়ে, ব্যক্ত=বেকত ইত্যাদি।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে—আদ্যকালে ষ কে লোকে অনেকস্থলে খ বলিয়া উচ্চারণকরিত, যথা—পুরুষ=পুরুখ, ঋষভ=ঋখভইত্যাদি। হিন্দিতে অদ্যাপি এইরূপ ব্যবহার আছে।

ছন্দ—আদ্যকালের যে সকল পদ্যরচনা দেখাযায়, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটীমাত্র ছন্দ দৃষ্টহয়। এক্ষণ-কার চলিত পয়ারের নিয়ম এই যে, উহার দুইটী সমান অংশ থাকে। তাহার প্রথম অংশটীকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষ-টীকে পরার্দ্ধ কহে। পূর্ব্বার্দ্ধের উপান্তিম ও অন্তিম বর্ণ যাহা হইবে, পরার্দ্ধের ঐ ঐ বর্ণও অবিকল তাহাই হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধেরই ৮ ম ও ১৪ শ অক্ষরে যতি—অর্থাৎ বিরাম থাকা আবশ্যক। ত্রিপদীতেও দুইটী অর্দ্ধ থাকে, প্রত্যেক অর্দ্ধে বিংশতিটী করিয়া অক্ষর; উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল, প্রত্যেক

অর্দ্ধেই ষষ্ঠ দ্বাদশ ও বিংশ অক্ষরে যতি এবং ৬ষ্ঠ ও ১২শ বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল। এই ত্রিপদীকে লঘুত্রিপদী কহে—এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ ত্রিপদীও আছে। এই পয়ার ও ত্রিপদীর শেষবর্ণে মিলন থাকাতে ইহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে।

এক্ষণে যেরূপ অক্ষরগণনার নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী রচিত হইতেছে, আদ্যকবিরা সেরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের পদ্যসকল সঙ্গীতময়—সুতরাং সঙ্গীতের স্বরের অনুরোধে, যেখানে আবশ্যকবোধ করিয়াছেন সেইখানেই, তাঁহারা যতি দিয়াছেন—তাহাতে কোনস্থলে অক্ষর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কোনস্থলে বা কমিয়াপড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বর্ণের মিলনবিষয়েও তত সাবধান ছিলেন না। যে সকল বর্ণের উচ্চারণ কর্ণে প্রায় একবিধ বলিয়াই বোধহয়, তাঁহারা তাদৃশ বর্ণেরও অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণের এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের—যথা ক ও খ এর, ত ও থ এর, গ ও ঘ এর এবং ব ও ভএর মিল রাখিয়াগিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা এবিষয়ের একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কাহারও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেহয় নাই, তাঁহাদিগের সৃষ্ট শৃঙ্খলাই মেরামত করিয়া আমরা পরিতেছি।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, তাঁহারা কি উপাদান ও কি উপকরণ লইয়া সে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ পয়ার

ও ত্রিপদীর মূল কি?—যখন্ বাঙ্গালাভাষারই আদিমূল সংস্কৃত হইল, তখন তদঙ্গীভুত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্‌ছন্দ যেরূপ সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেইরূপ। সুতরাং পয়ারকেই অনুষ্টুভের স্থানীয় বলিয়া বোধহয়। কিন্তু ইহা যে, অনুষ্টুপ্ হইতেই উপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতেপারাযাইতেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রথমতঃ অনুষ্টুপ্ চতুষ্পাদ্, ইহা দ্বিপদ; অনুষ্টুভে সমুদয়ে ৩২ অক্ষর, ইহাতে ২৮; অনুষ্টুভে বর্ণের গুরু লঘুতার নিয়ম আছে, ইহাতে তাহার প্রায় কিছুই নাই—শুনিতেও দুই ছন্দ কর্ণে একবিধ বলিয়া কোনমতেই বোধহয়না। এইজন্য কেহ কেহ কহেন বাঙ্গালার বর্ত্তমানপয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর বয়েৎ নামক ছন্দের অনুকারক। একটী বয়েৎ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল—

করীমা ববখ্‌সায় বর্‌হালমা।
কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া॥ (পন্দেনামা)

পারসীর শ্লোক বাঙ্গালাঅক্ষরে লিখিয়া তাহার বর্ণ সঙ্খ্যাদিকরা যুক্তিসঙ্গত হয় না বটে, কিন্তু আমরা ইহা অন্য অক্ষরে লিখিয়া বিচার করিতে পারিনা—সুতরাং ইহা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া বিচার করাযাইতেছে।—দেখ, এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত; ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টী অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির

পর ৬টী অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধহয়না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তন্মাত্র দর্শনেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতেযাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত হয়। সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যার তার অধমর্ণ হওয়া অপেক্ষা, যাহার নিকট সম্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল। আমরা দেখিতেছি—গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে, তাহাদিগের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিম্নভাগে কয়েকটী সেই গীত উদ্ধৃত হইল—

রাধিকা তব বিরহে কেশব!—

সরস মসৃণমপি, মলয়জপঙ্কং। ‘পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং।’
শ্বসিত পবনমনু,-পমপরিণাহং। মদন দহনমিব, বহতি সদাহং॥
দিশি দিশি কিরতি স,-জলকণ জালং। নয়ন নলিনমিব, বিগলিতনালং॥
নয়নবিষয়মপি, কিশলয়তল্পং। ‘গণয়তি বিহিতহু,-তাশবিকল্পং॥’
হরিরিতি হরিরিতি, জপতি সকামং। ‘বিরহ বিহিত মর,-ণেব নিকামং॥’

এই সকল ছন্দোবদ্ধ গীত অক্ষরগণনানুসারে রচিত নহে, মাত্রা * গণনানুসারে রচিত। ইহার প্রতি অর্দ্ধে

* লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দুইমাত্রা। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গবিশিষ্ট স্বর গুরু হয়।

ষোল মাত্রা, অষ্টমমাত্রার পর যতি এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে মিল। সুতরাং মাত্রার নিয়মানুসারে গণনায় কোন অর্দ্ধের অক্ষর স্থলবিশেষে বাড়িয়াযায়, স্থলবিশেষে কমিয়াপড়ে। সেইজন্যই অপরাপর পাদসকল পয়ারের তুল্য হইলেও ' ' চিহ্নিত ২য় ৮ম ও ১০ম পাদে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে ইহা বলাযাইতেপারে যে, উপরিউক্তবিধ গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণস্বরেও এই বৃত্ত এবং পূর্ব্বলিখিত—

কতিহুঁ মদন তনু, দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥

ইত্যাদি পূর্ব্বোদাহৃত পদকল্পতরুর ৮৬৮ সঙ্খ্যক প্রাচীনপয়ার যেন এক বলিয়াই বোধহয়।

ত্রিপদীও গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিতপ্রকার গীত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, একথাও এক্ষণে বলা যাইতে পারে—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপয়ানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলি সুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীলনিচোলং॥

এই বৃত্তের প্রত্যেক অর্দ্ধে ২৮টী মাত্রা আছে, ৮ম ১৬শ মাত্রায় যতি, ও মিল এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণেও মিল। ইহারও অনেক পঙ্ক্তি অক্ষরগণনানুসারেও ত্রিপদীর সহিত একরূপ হয় এবং কর্ণেও উভয়েরই উচ্চারণ একরূপ বলিয়া বোধহয়। অতএব এই সঙ্গীতময়বৃত্তের অনুকরণেই যে, ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই।

সম্ভব বিবেচনা করিতে গেলেও ইহাই প্রতীয়মান হয়।

কারণ জয়দেব বাঙ্গালাদেশের বীরভূমপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহার গীতগোবিন্দ অতি কোমল, ললিত ও মধুরভাষায় বিরচিত—তজ্জন্যই লোকের মন বিলক্ষণ আবর্জ্জিতহয়—বিশেষতঃ উহা পরমারাধ্য রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণন-সংক্রান্ত সঙ্গীতময় হওয়ায় এবং উক্ত সঙ্গীতের অন্ততমে "দেহি পদপল্লব মুদারং" এই অংশটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক লিখিতহওয়ার প্রসিদ্ধি থাকায়, উক্তগ্রন্থ ভাগবতদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। সুতরাং আদ্য কবিরা বাঙ্গালায় উক্তরূপ গীতবিরচনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশসম্ভূত তাদৃশ শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া স্বকীয় গীতের ছন্দোরচনা করিবেন, ইহা যুক্তিবহির্ভূত নহে। কিন্তু এ কথা পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, আধুনিক পয়ার ত্রিপদীতে অক্ষরগণনার যেরূপ কসাকসি হইয়াছে—পূর্ব্বে তাহা ছিলনা। আদ্য কবিরা বোধহয় প্রথমে মাত্রানুসারেই উক্তরূপ পদ্যের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কতিহুঁ মদনতনু ইত্যাদি পদ্য মাত্রাগণনানুসারেও প্রায় ঠিকই হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে মাত্রাগণনার রীতি রক্ষাকরা তাদৃশ সুবিধাজনক হয়না, দেখিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ শিথিলাদর হয়েন এবং সুরের অনুরোধে আবশ্যকমত বিরাম দিয়া যান। অক্ষরগণনার রীতি কালক্রমে আপনাআপনি হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তদ্বিষয়ের কোন নিয়মপদ্ধতি করিয়া যান নাই এবং তদনুসারে চলেনও নাই।

'পয়ার' এই শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারাযায়না, কিন্তু বোধহয় 'পাদ'শব্দের অপভ্রংশে পায়া বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়—যথা সেপায়া, খাটের পায়া ইত্যাদি এবং ঐ পয়া হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ- (চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপ ছন্দোবোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

'ত্রিপদী' ইহা সংস্কৃতশব্দ। উহার প্রতি অর্দ্ধে ৩ স্থানে যতি, অথবা উহার ৩টী করিয়া পদ (চরণ) থাকাতে উহাকে ত্রিপদী কহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের উৎপত্তিকাল হইতে আমরা মধ্যকাল গণনা করিয়াছি। চৈতন্যদেব ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খৃঃ অঃ) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪৫৫শকে* (খৃঃ ১৫৩৩অব্দে)

---

* শাকেচতুর্দশশতেরবিবাজিযুক্তে গৌরোহরি ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ
তস্মিং শ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলাগ্রন্থোঽয় মাবিরভবৎকতমস্য বক্ত্রাৎ
চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান।
চৈতন্য চরিতামৃত আদ্যখণ্ড।

লীলাচলে (জগন্নাথক্ষেত্রে) তিরোভূত হয়েন। মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া নারীগণ প্রথমে ইহাঁকে 'নিমাই' এবং অত্যুজ্জ্বলগৌরকান্তি বলিয়া কেহ২ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়াও ডাকিত। অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়; পরে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই তাঁহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল। ইনি অলৌকিক-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার পুরাণ ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পরম প্রাবীণ্যলাভ করেন, এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণলিখিত—

হরে র্নাম হরে র্নাম হরে র্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতি রন্যথা॥

এই বচন প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনামোচ্চারণ, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিভক্তি ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই, এই মত প্রচারকরিয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহুসঙ্খ্যক স্বগণ ও স্বসহচর সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গের সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার লোকাতীত রূপলাবণ্য ও অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধ্যাদিসন্দর্শনে পূর্ব্বহইতেই তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া কতক লোকের বোধহইয়াছিল। এক্ষণে আবার তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে নূতনপ্রকার মতের উদ্ভাবন ও সঙ্কীর্ত্তন সময়ে

অকৃত্রিম পরমানন্দে মগ্নহইয়া নর্ত্তন এবং হরিনামোচ্চারণ-মাত্রেই রোমাঞ্চ অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব অবলোকন করিয়া তাহাদিগের ঐ বোধ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতাদি সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থসকল হইতেই উদ্ধৃত বচনপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করাহইত—উহার অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচলিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী অপেক্ষা অনেক সহজ—কিহিন্দু, কিমুসলমান কাহাকেও উহা অবলম্বন করাইতে বাধা ছিলনা—এবং তিনি নিতান্ত দুঃশীলের সুশীলতাসম্পাদন, কুষ্ঠীর কুষ্ঠবিমোচন প্রভৃতি কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন, এরূপ প্রবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং অচিরকাল-মধ্যেই তাঁহার শিষ্য অসঙ্খ্য হইয়া উঠিল। সন্যাস আশ্রম অবলম্বনের পর তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, জগন্নাথক্ষেত্র, সেতুবন্ধ প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন, এবং তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বমত সংস্থাপনকরেন। ঐ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারকরিত, সুতরাং তিনি যেখানে যেখানে যাইতেন, সেইখানেই শিষ্যসঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইত। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাই বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের পুনরুদ্ধার করেন এবং তদীয় লীলাবর্ণন-

সংক্রান্ত বহুলগ্রন্থ রচনাকরেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক রূপগোস্বামীই ১২।১৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ খানি উৎকৃষ্ট নাটক, ১ খানি অলঙ্কার ও ১ খানি ব্যাকরণ আছে। তদ্ভিন্ন সনাতনগোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপূর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের বিরচিত বহুল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ চৈতন্মের উৎপত্তি হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা-দেশের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গণনাকরিতে হইবে। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্‌সার সুবিচারে প্রজালোক অনেক নিরুপদ্রব ছিল; ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্ব্বিগাহ-ধিষণা-শক্তিসহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন-রূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন, এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্যসহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়াদিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব-নামক অভিনবপ্রকার স্মৃতিসংগ্রহের প্রণয়নকরেন। অধিক কি বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ঐ সময়েই হইয়াছে বা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে।

বাঙ্গালাভাষার পক্ষে বলিতে গেলে ঐ সময়কেই ইহার উৎপত্তিকাল বলিলেও বেশি অসঙ্গত হয়না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্তরূপপদাবলীভিন্ন আদ্যকা-লের একখানিও গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। চৈতন্মের

সময় হইতেই বাঙ্গালার গ্রন্থরচনা আরব্ধ হয়। ইহাও এক-প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদ্যকালের পণ্ডিতদিগের চিত্তভূমিতে যে কিছু নূতনভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহা তাঁহারা পণ্ডিতসমাজেরই প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন —জনসাধারণকে দেখাইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন না। কিন্তু চৈতন্যশিষ্যদিগের সেরূপ ভাব ছিল না। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আপামর সাধারণ সকলেরই আশ্রয়ণীয়; অতএব তাঁহারা খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের ন্যায় তৎপ্রচারার্থ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ববিধ লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা স্বাবলম্বিত ধর্ম্মপ্রণালীসকল কেবল পণ্ডিতজনগম্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের বোধার্থ চলিতভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সময়কে বাঙ্গালাগ্রন্থপ্রণয়নের আদিকাল বলা অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদিগের ঐ সকল গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখাযাইতেছে যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালাকাব্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পরবিবাদসংক্রান্ত যে সকল গল্প আছে, তাহাতে বীরধর্ম্মী শাক্তদিগের জয় ও পশুবৎ নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হয়, তচ্ছ্রবণে শাক্তেরা সহাস্যমুখ ও বৈষ্ণবেরা ম্লানকান্তি হইয়াথাকেন। কিন্তু

কাহাদের হইতে বাঙ্গালাকাব্যের জন্মলাভ হইয়াছে? কাহারা বিবসনা মাতৃভাষাকে বসনভূষণাদি দ্বারা সাজাইবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছে? এ বিষয়ে ইতিহাস কাহাদের নাম চিরকাল সগৌরবে স্মরণ করিবে? ইত্যাদিরূপ বিচার ও বিবাদ উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট শাক্তদিগের মুখ অবশ্য মলিন ও অবনত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালাভাষায় প্রথমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক। অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াথাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগোস্বামীকে রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ভক্তমালনামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জীব মানকরনিবাসী এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ধনাকাঙ্ক্ষায় বহুকাল ব্যাপিয়া বারাণসীতে মহাদেবের আরাধনা করিলে পর, মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আদেশকরেন যে, তুমি বৃন্দাবনবাসী সনাতন গোস্বামীর নিকট গমন করিলে তিনি তোমাকে অভিমত ধনদান করিবেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্‌সার দুই মুসলমান মন্ত্রী চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রূপ ও সনাতন নামগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে বৃন্দাবনে তপস্যা

করিতেছিলেন। একদা সনাতন যমুনায় স্নান করিতে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে একটী স্পর্শমণি (পরেশপাথর) দেখিতেপাইলেন, কিন্তু নিজের নিস্পৃহতাবশতঃ তাহা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিবার উদ্দেশে একখানি খাপ্‌রা চাপাদিয়া রাখিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। এমত সময়ে জীব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শঙ্করের আদেশ জানাইলে পর, সনাতন প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আমি সন্ন্যাসী, তোমাকে দিবার জন্য ধন কোথা পাইব? অনন্তর স্পর্শমণির কথা সহসা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানের খাপ্‌রার মধ্যহইতে মণি বাহির করিয়া লইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে তাহা না পাইয়া খুঁজিয়া দিবার জন্য সনাতনকে কহিলেন। সনাতন উত্তর করিলেন, আমি স্নান করিয়াছি, এখন্ উহা স্পর্শকরিব না; তুমি পুনর্ব্বার অন্বেষণ কর। তাহা করাতে মণিপ্রাপ্ত হইয়া জীব, পরমানন্দে বিদায় লইয়া চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইল যে, আমি কি নীচাশয়। কি মূঢ়! আমি যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে এতকাল কঠোর তপস্যা করিলাম, এ ব্যক্তি সেই বস্তু স্বহস্তে পাইয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিল! নিজের তাহা রাখিবার ইচ্ছা করা দূরে থাকুক, ঘৃণাকরিয়া স্পর্শও করিল না! এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পথহইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সনাতনের চরণে নিপতিত হইয়া, তিনি যে ধন পাইয়া এ ধনকে তুচ্ছজ্ঞান করি-

য়াছেন, সেই ধন পাইবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সনাতন, ব্রাহ্মণকে লোভনির্মুক্ত বোধ না করিয়া প্রথমে দিতে স্বীকার করিলেন না। পরে ব্রাহ্মণ সেই হস্তগত স্পর্শমণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতুই স্বর্ণ হয়) যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিলে পর, সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পরম ভাগবত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর জীবগোস্বামী কৃষ্ণবিষয়ক নানা সংস্কৃতগ্রন্থ রচনাকরেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাঁহার যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বাঙ্গলা করচার নামোল্লেখ করেন নাই। আমরাও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও জীবগো-স্বামীর করচা প্রাপ্তহই নাই। বোধহয় তাহা বিরলপ্রচার হইয়াছে। তাঁহার বংশীয়েরা এক্ষণে কাঠ্‌রা মাড়্‌গাঁয় বসতি করেন, তাঁহাদের বাটীতে উহা আছে কিনা, বলিতে পারা যায় না। আমাদের কোন বন্ধু 'জীবগোস্বামীর করচা, ব-লিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। এমনকি, সমালোচনার যোগ্য বলিয়াই বোধহয় না। তবে অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বা-ঙ্গালার প্রথম রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকখানি অতিক্ষুদ্র; ইহাতে রূপ, বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কিরূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেন্‌সার কারাগার

হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং বারাণসীতে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুইভ্রাতার গোবর্দ্ধনদর্শন—তথায় নিত্যবস্তু-বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জরী চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণসহচরীদিগের বয়োনিরূপণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকারের কিছুমাত্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধহয় বটে। বিবিধার্থসংগ্রহলেখকের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছে।

জীবগোস্বামীর করচার পরই বোধহয় বৃন্দাবনদাসবিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়। ইহা ভিন্নও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সে সমুদয়ের সমালোচনাকরা তত আবশ্যক বোধহয় না। আমরা প্রধানতঃ কেবল চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতেরই সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল।

এই গ্রন্থ পরমভাগবত বৃন্দাবনদাসকর্ত্তৃক বিরচিত। বৃন্দাবন নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে সামান্যাকারে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—যথা

সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥ ম, খ, ৫ অ

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ বৃন্দাবনরচিত চৈত

ন্যমঙ্গলের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহাকেই প্রধানতঃ অবলম্ব করিয়া তাঁহার চরিতামৃত লিখিত হই-য়াছে, ইহা অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বৃন্দাবনদাসের পরিচয়প্রদানে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই জানাযায় যে, চৈতন্যের সহচর ও শিষ্য কুমারহট্টবাসী শ্রীনিবাসপণ্ডিতের নারায়ণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পণ্ডিত, বোধহয় কোনকার্য্যবশতঃ নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন এবং ভোজন হইলে পর, নারায়ণী তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরিয়া চতুর্বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না হওয়াতে চৈতন্যের বড় স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ নারায়ণীর গর্ভজাত। এই বিবরণ দ্বারা ইহা এক প্রকার স্থির হই-তেছে যে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্যের তিরোধানের পর গ্রন্থাদি রচনাকরিয়াছেন। কারণ চৈতন্যের সন্ন্যাসাবলম্বনের সময়ে অর্থাৎ যখন্ তাঁহার বয়স ২৪। ২৫ বৎসর তখন্, নারায়ণী ৪ বৎসরের ছিলেন—তৎপরে ১২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্তান হওয়া এবং বৃন্দাবনকেই প্রথম পুত্র বলিয়া, ধরিয়ালইলেও চৈতন্যের অন্তর্ধানসময়ে বৃন্দাবনের বয়ঃ-ক্রম ১২ বৎসরের অধিক হয়না। তৎকালে গ্রন্থরচনা সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যতিরোধানের ১৫। ১৬ বৎ-সর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪৭০ শকে (খ্রীঃ১৫৪৮ অব্দে) বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।

যাহাহউক, চরিতামৃতকার বৃন্দাবনরচিত চৈতন্যমঙ্গলের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োভূয়ঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবতের বিষয়ে কোনস্থলে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই—কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৃন্দাবনদাসবিরচিত চৈতন্যমঙ্গলনামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই—লোচনদাসবিরচিত এক চৈতন্যমঙ্গল আছে। বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই এবং চরিতামৃতকার যে যে বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন জানিবার জন্য চৈতন্যমঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে—অতএব আমাদের বোধহয় চরিতামৃতকারোল্লিখিত চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে যে নামে ঐ গ্রন্থ একণে প্রসিদ্ধ, তাহা ত্যাগকরিয়া চরিতামৃতকার কিজন্য অপর নাম দ্বারা উহার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের এই অনুমান হয় যে, গ্রন্থকার নিজমুখে কোন স্থলে ঐ গ্রন্থের কোন নামকরণ করেন নাই, কেবল মুদ্রিত পুস্তকের নির্দ্দেশপত্রে মুদ্রাকারেরা " চৈতন্য ভাগবত " বলিয়া নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আদিখণ্ডের শেষে " ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডং সম্পুর্ণম্ " এইমাত্র উল্লেখ আছে। অতএব এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থকে কেহ চৈতন্যভাগবত কেহবা চৈতন্যমঙ্গল কহিত—কালক্রমে দ্বিতীয় নাম বিলুপ্ত হইয়া প্রথম নামটাই রহিয়া

গিয়াছে। চরিতামৃতকার মুদ্রিত পুস্তক পান নাই। তিনি যে হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহাতে আদিখণ্ডের শেষস্থ 'চৈতন্যভাগবত' এরূপ নামোল্লেখ ছিল কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। অতএব তাঁহার ঐ নাম নির্দ্দেশ না করা অসঙ্গত বোধহয়না। তদ্ভিন্ন তিনি ঐ গ্রন্থের শেষ খণ্ডের দুই স্থানে 'চৈতন্যমঙ্গল' এই নাম দেখিয়াছিলেন যথা—

তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে। বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে॥৬অ,
নাচেনঅদ্বৈতসিংহ আনন্দেবিহ্বল। চতুর্দ্দিকে গায়সভে চৈতন্যমঙ্গল॥৭অ,

অতএব এই দেখিয়াই হউক অথবা কোনরূপ ভ্রমবশতই হউক এই গ্রন্থের নাম চরিতামৃতকারের 'চৈতন্যমঙ্গল' বলিয়াই বোধহইয়াছিল; নচেৎ বৃন্দাবনদাসরচিত চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত পৃথক্ গ্রন্থ নহে। যাহা হউক আমরা চৈতন্যভাগবতনামেই ইহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম। চৈতন্যভাগবত কিছু বৃহৎ পুস্তক। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াভূমিতে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে—মধ্যখণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাসপ্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তদিগের নিকট ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, পাতকীদিগের উদ্ধারকরণ প্রভৃতি বহুবিধ লোকাতিগ কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। অন্ত্য বা শেষ খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কাঁটোয়া (কণ্টক নগর) স্থিত কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন,

শিরোমুণ্ডন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামগ্রহণ, লীলাচলে গমন, গৌড় দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্রে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার, শিষ্যসঙ্খ্যা-বৃদ্ধি ও পরিশেষে লীলাচলে গিয়া পুনরবস্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে চৈতন্যের মৃত্যু বর্ণিত হয়নাই—বোধহয় ভাগবতেরা তাহা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া সে অংশ ত্যাগকরা হইয়াছে।

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। পুরাণাদি অনেক গ্রন্থ হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বড় গোঁড়া বৈরাগী ছিলেন। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চৈতন্যকে অবতার বলিয়া মানিতেন না, এজন্য তিনি যেখানে যো পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে নাথি মার তার শিরের উপরে॥

ইত্যাদিরূপে সাধুজনবিগর্হিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াও গালি দিতে ক্রুটি করেন নাই। এমন কি বোধহয় তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহাহইলে তিনি এক দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকললোকেরই প্রাণসংহার করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ উদ্ধত ছিলেন, বর্ণিত নায়ককেও সময়ে সময়ে সেইরূপ উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যখন্ গৌরাঙ্গকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিষেধকারী নবদ্বীপস্থ কাজীর ভবনে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন্ গৌ-

রাঙ্গ শিষ্যসমভিব্যাহারে কাজীর বাগানবাগিচা নষ্ট করিয়া ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া নস্তানাবুদ করিয়া পরিশেষে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় কাজীর গৃহে অগ্নি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চৈতন্যকে ওরূপ উদ্ধত বলিয়া জানিতাম না। ধর্ম্মসংস্থাপক দরিদ্রব্রাহ্মণের পক্ষে ওরূপ হওয়া উচিত বোধহয়না। চৈতন্যচরিতামৃতকার অমন স্থলেও গৌরাঙ্গকে তত উদ্ধত বর্ণন করেন নাই।

যাহাহউক, বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব মন্দ ছিলনা। তিনি যে স্থলে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বেশ পরিষ্কারও বিশদ হইয়াছে, পাঠমাত্র আমূল বৃত্তান্ত স্পষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। তদ্ভিন্ন তিনি হাস্য করুণ প্রভৃতি রসের বিলক্ষণ উদ্দীপন করিয়াছেন। কাজীর অনুচরেরা কীর্ত্তন, মূর্চ্ছা ও ক্রন্দনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কথোপকথন করিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ পরিহাস-রসিকতা আছে এবং গৃহহইতে বহির্গমনকালে শচীসমীপে গৌরাঙ্গের বিদায়গ্রহণঅবসরে করুণ-রসের সুন্দর উদ্দীপ্তি হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কিয়দংশ নিম্ন-ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।——

কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়। সমৃদ্ধি দেখি আপনার শাস্ত্র গায়॥ রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া। কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥ যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥ এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য। সেই সে হিন্দুর ভূত তাহারই সে কার্য্য॥ কেহ বলে বামনা এতেক

কান্দে কেন। বামনার দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥ কেহ বলে বামনা আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে হেন সমুঝি সদায়॥ কেহ বলে বামনা দেখিলে লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥ ম, খ, ২৩অ,।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥ বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥ না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥ কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥ অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥ পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥ ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥ প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥ (ঐ শেষ অ,)

গ্রন্থকারের ভাবগ্রাহিতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত নিম্নভাগটী উদ্ধৃত হইল—

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়॥ এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥ (ঐ ঐ)

চৈতন্যভাগবতের ভাষা খুবমিষ্ট নাহউক, বিশদ বটে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ভাষাদ্বারা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে প্রাচীনকালের ভাষা, এ জন্য ইহাতে কতক খুব সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, এবং কতক নিতান্ত অপভ্রংশ শব্দও দেখিতেপাওয়াযায়। ক্রিয়াপদও স্থানে স্থানে সেকেলে গোছের আছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কয়েকটী শব্দ ও

ক্রিয়ার উল্লেখ করাযাইতেছে, (সংস্কৃত) কথংকথমপি, বাক্যোবাক্য, সাঙ্গোপাঙ্গ, কাম্বায়; (প্রাকৃত) পহুঁ, চুন্দ, তান, যহি; (অপভ্রংশ) তছু, মুঞি, যৈছে, কথি; (ক্রিয়া) কদর্থিবে, বোলে, করিমু, নখিতে ইত্যাদি।

এইগ্রন্থ সমুদয়ই পয়ারে গ্রথিত, কেবল কয়েকটী গীতস্থলে ত্রিপদী আছে। ইহার সময়ে মিত্রাক্ষরতা ও মিতাক্ষরতার নিয়ম সম্যক্ অনুসৃত হয়নাই—নাম=স্থান; অবাক্য=অবাহ্য; প্রভাব=অনুরাগ; যোগ=লোভ; দুগ্ধ= মুদ্গ; বাস=জাত; নহে=লয়ে ইত্যাদি শব্দ সকলও মিত্রাক্ষরস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবির পরবর্ত্তী কবিদিগেরও রচনায় মিতাক্ষরতার যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাঁর কিছু নৈসর্গিকী-শক্তি ছিল বলিয়া, ইহার রচনায় সেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত সন্দর্ভ মধ্যেই ইহার প্রমাণ লক্ষিত হইবে।

চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৃন্দাবনদাসের আর কোন গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহা স্থির বলাযায়না, কিন্তু ঐ গ্রন্থাতিরিক্তও কতকগুলি গীত তাঁহার ছিল, তাহা ইতস্ততঃ দৃষ্টহইয়া থাকে। বৃন্দাবনের সময়ে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গীতের প্রচার ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া তদুপরি কটাক্ষ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যভাগবতের রচনার কিছুকালপরেই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতনামক গ্রন্থের রচনা করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত ঝামট্‌পুর নামক গ্রামে কৃষ্ণদাসের বাস ছিল। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বগ্রন্থের আদিখণ্ডান্তর্গত ৫ম অধ্যায়ে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দরূপী বলরাম স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শনদিয়া বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন গমনকরিয়া রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেথাকেন। চরিতামৃতগ্রন্থ বোধহয় ঐস্থানে বসিয়াই রচনাকরিয়া থাকিবেন। কারণ অনেক স্থানে "আইনু বৃন্দাবন" "এই বৃন্দাবন" এইরূপ কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থকার কোন স্থানে নিজের সময়নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপরিলিখিতরূপ পরিচয়দানদ্বারাই ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি ১৪৯৫ শকের (খৃঃ ১৫৭৩ অব্দের) পর ১০। ১৫ বৎসরের মধ্যেই এইগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নামক সংস্কৃতনাটক ১৪৯৫ শকে লিখিত হয়। চরিতামৃতে ঐ নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত আছে—সুতরাং ইহা তৎপূর্ব্বসময়ে রচিত হওয়া

সম্ভব নহে। না হউক কিন্তু উহার অধিককাল পরে রচিত, এ কথাও বলা যাইতে পারে না—কারণ তিনি যাঁহাদের শিষ্যতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চৈতন্যের সমসাময়িক লোক—চৈতন্যের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের অধিককাল জীবিত থাকা অসম্ভব।

চরিতামৃতও চৈতন্যের সমস্তলীলাসংক্রান্ত পদ্যময় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাও আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যভাগবতের খণ্ডত্রয়ে যেরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে, ইহার খণ্ডত্রয়েও প্রায় সেইরূপ বিবরণ; তবে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে এই মাত্র। ইনি অনেকবার বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে যে বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নাই, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন। ফলতঃ তাহাই বটে; চরিতামৃতে চৈতন্যের যত দেশভ্রমণের কথা আছে, ভাগবতে তাহা নাই। অনেক ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

কবি সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই কয়েকটী করিয়া স্বরচিত শ্লোক বসাইয়া দিয়াছেন। প্রথম কয়েকটী শ্লোকের সংস্কৃতে টীকাও করিয়াদিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক পাঠকরিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়াযায়। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ এবং তাৎকালিক মহাত্মগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, হরিভক্তিবিলাস,

বিল্বমঙ্গল, লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে ঐ সকল শ্লোকের বাঙ্গালাপদ্যে অর্থ করিয়াদিয়াছেন। চৈতন্যের অবতারবিষয়ে কোন পুরাণে বর্ণনা নাই, এজন্য অনেকে চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা করেননা, এই দেখিয়া তিনি ভাগবতের কৃষ্ণবিষয়ক কতিপয় শ্লোককে পরম কৌশলসহকারে চৈতন্যবিষয়ক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ; অতএব ইহার বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়—সত্যবোধে যাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, গ্রন্থকার তজ্জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্বশক্তিপ্রকাশের জন্য সেরূপ চেষ্টা করেননাই। তাঁহার রচনা পদ্যময় এইমাত্র—রামায়ণ, মহাভারতাদির গ্রন্থকারেরা ধর্ম্মকথার সহিত যেরূপ চমৎকার কবিত্বপ্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, ইনি তাহার কিছুই করেননাই। ইনি কথায় কথায় যদি অত অধিক সংস্কৃতবচন উদ্ধৃত না করিতেন, তাহাহইলে ইহাঁর গ্রন্থ বোধহয় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত। অধিক বচন উদ্ধৃত করায়, পাঠমাত্র গ্রন্থের সমুদয় বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বোধহয় গ্রন্থের পারিপাট্যসম্পাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিলনা—প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা চৈতন্য-

মতকে প্রামাণিক ও তাঁহার নিজগ্রন্থকে শ্রদ্ধাস্পদ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্যছিল। যাহাহউক তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভাগবতেরা এই গ্রন্থের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করেন, অনেকে প্রতিদিন গন্ধপুষ্পদ্বারা ঐপুস্তক পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রব্য বা সুন্দর নহে। চৈতন্যভাগবতের রচনাতে যেমন কতক শুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, কতক নিতান্তঅপভ্রংশ শব্দ ও কতক পুরাতন ক্রিয়ার মিশ্রণ লক্ষিত হয়, ইহাতেও তাহাই আছে। অভ্র, আরত্রিক, অর্থবাদ, মৃদ্‌ভাজন; বোল, তান, মহান্ত, দোহে; তিহোঁ, ঐছে, মুঞি, কথি; দঢ়াইল, পুছিল, জুয়ায়, করিমু ইত্যাদি উহার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রভৃতির সময়ে সংযুক্তশব্দের বিপ্রকর্ষণক্রিয়ার যেরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, চরিতামৃতের সময়ে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল।

চরিতামৃত প্রায় সমস্তই পয়ারে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক স্থানে ত্রিপদী আছে। ছন্দে অক্ষরসাম্যের নিয়মের যতদূর ব্যতিক্রম হইয়াছে, মিত্রাক্ষরতার ততদূর ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াগেল—

এইরূপ কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে। প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে॥
মহা প্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরবপাত্র॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন্ন প্রভুর পারিষদগণ॥

কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রিশয়ন॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
(ম, খ, ১৯ অ,)

চরিতামৃতের আদ্যন্তই এইরূপ বাঁকাভাষায় লিখিত নহে—অনেকস্থলে বেশ সরলভাষা আছে। অতএব অনুমান হয় গ্রন্থকার, স্বাধিষ্ঠানবৃন্দাবনের অনেককথাও গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত 'অদ্বৈতসূত্র-কড়চা' 'স্বরূপবর্ণন' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতেও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায়

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।———কহে কৃষ্ণদাস॥

এইরূপ ভণিতি আছে। সে সকলগ্রন্থও এইরূপ গৌরাঙ্গ—সংক্রান্ত, অতএব তাহাদের আর পৃথক্ সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালাগ্রন্থসকলের অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ, চণ্ডী, মনসারভাসান, মহাভারত, শিবসঙ্কীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্যসকলের প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের কথাই অগ্রে বলিতে হইতেছে।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বা কোন্ সময়ে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম পুরাণের উপাখ্যান—সুতরাং গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের রীতি নীতি প্রভৃতি সন্দর্শনকরিয়া সময়ের অনুমান করিবার যো নাই। গঙ্গারতরণস্থলে তিনি মেড়তলা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আক্‌নামাহেশ প্রভৃতি মূলরামায়ণে অনুল্লিখিত কয়েকটী গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তদ্বীপের সারস্থান বলিয়া নবদ্বীপের প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহার ঐরূপ প্রশংসা হওয়া অসম্ভব বোধহয়না। তাহাহইলে কৃত্তিবাস চৈতন্য-দেবের পরসাময়িক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

গ্রন্থের ভাষাদৃষ্টে অনেকস্থলে সময় অনুমিত হইয়া-থাকে, কিন্তু প্রকৃতবিষয়ে তাহা করিবারও কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ দেখিতে পাওয়াযায়, কেহ কেহ বলেন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন সাহিত্যাধ্যাপক ৺ জয়গোপাল তর্কা-লঙ্কারমহাশয়কর্ত্তৃক সংশোধিত; সুতরাং উহা কৃত্তিবাসের প্রকৃতরচনা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। অতএব তদ্দৃষ্টে কোন সিদ্ধান্তকরা সঙ্গত হয়না। প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ অতীব দুষ্প্রাপ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। উহা

সন ১০৯৯ সালে লিখিত অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসরের পুস্তক। উহার এবং মুদ্রিতরামায়ণের ভাষা ছন্দ ও আনুপূর্ব্বী বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়। নিম্নভাগে উভয় পুস্তকেরই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বালিবধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে॥ সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। লুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ॥ শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান। ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ॥ একেবারে আমার করিতে সর্ব্বনাশ। সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ॥ বিচ্ছেদ যাতনা যত জানহ আপনি। তবে কেন আমারে হে দিলে রঘুমণি॥ প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়। আমি শাপ দিব তাহা ফলিবে নিশ্চয়॥ সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। সীতারে আনিবে বটে বহু পরিশ্রমে॥ কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ। কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস॥ কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥ আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে। কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥ কলিকাতা-মুদ্রিত রামায়ণ।

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকূলে। আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন ছলে॥ দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ। আদেশা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ॥ প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণ হৃদয়। মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয়॥ সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে। সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে॥ সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ। কত্তো দিন বহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ॥ তুমি যেমন কাঁদাইলে বানরের নারী। তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী॥

প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ।

এই সকল সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতেপারাযায় যে, জয়গোপালতর্কালঙ্কারমহাশয়দ্বারাই হউক বা যাঁহাদ্বারাই হউক, মুদ্রিতরামায়ণ মূল কৃত্তিবাসীরামায়ণ হইতে অনে-

কাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপরিউদ্ধৃত অংশে দৃষ্টহইবে যে, কৃত্তিবাস ছন্দের অক্ষরগণনার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেননাই; তাঁহার গ্রন্থ সঙ্গীতহইবে, এইঅভিপ্রায়ে গানের সুর মিলাইতে যেখানে যত অক্ষর দেওয়াআবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিয়াছিলেন। মুদ্রিত রামায়ণ বিশুদ্ধ পয়ারের রীতিতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশবা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল মুদ্রিত রামায়ণ দর্শনকরিয়া কৃত্তিবাসের রচনার সমালোচনকরা কোন মতেই সঙ্গত হয় না—কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ সমগ্ররূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই মুদ্রিতরামায়ণের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ হানি নাই; যেহেতু উভয়ের মাংসযোজনাবিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। কবিত্ব সেই অস্থিগত।

মুদ্রিত রামায়ণের ভাষা ও ছন্দের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতাদর্শনে পূর্ব্বে আমাদের এক প্রকার স্থির বোধহইয়াছিল যে, কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পরসময়বর্ত্তী লোক। কিন্তু প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন পূর্ব্বোক্তপুস্তকখানি দেখিতে পাইয়া তাহা আমাদের আর একবারও বোধহয়না,—কৃত্তিবাসকে অবশ্যই মুকুন্দরামঅপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে ইচ্ছা হয়।

সকলেও তাহাই বলিয়াথাকেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কত দিন পূর্ব্বে কৃত্তিবাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে কথা কেহই স্থির বলিতে পারেন না। বলিবার কোন উপায়ও নাই। যাহাহউক অনেকে অনুমান করেন যে, চণ্ডীরচনার ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। যদি এ অনুমান স্থির হয়, তবে মোটামোটি এই বলাযাইতেপারে যে, ১৪৬০ শকে [১৫৩৮ খৃঃঅব্দে] রামায়ণের রচনা হয়। যেহেতু চণ্ডীকাব্যের সময়নিরূপণকালে সপ্রমাণ করাযাইবে যে, উহা ১৪৯৯ শকে [১৫৭৭ খৃঃঅব্দে] রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সময়নিরূপণ করা যেরূপ দুষ্কর, তাঁহার জীবনবৃত্ত স্থিরকরাও সেইরূপ দুষ্কর। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে এই কয়েকটী কবিতা আছে——

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ (অরণ্যকাণ্ড)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতী।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ (কিস্কিন্ধ্যা)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে॥ (আরণ্য)
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষাকবি কৃত্তিবাস॥ (কিস্কিন্ধ্যা)

এই গুলি পাঠ করিয়া জানিতেপারাযায় যে, কৃত্তিবাস ফুলিয়া নামক প্রসিদ্ধগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ বা মাতামহের নাম মুরারি ওঝা ছিল। এক্ষণে বিষবৈদ্য ও ডাইন্ পিশাচাবিষ্ট-

দিগের চিকিৎসকদিগকে ওঝা বলিয়াথাকে—কিন্তু মুরারি ওঝা বোধহয় সেরূপ ছিলেন না। কারণ পূর্ব্বে পৌরোহিত্যব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণের ওঝাই উপাধি ছিল; যেহেতু ওঝাশব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়শব্দের অপভ্রংশে জন্মিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে সাঁইওঝা দনাইওঝা প্রভৃতির বিবরণে ঐ কথাই সপ্রমাণ হইয়াথাকে। এক্ষণেও দিনাজপুর মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি অনেকস্থানে ওঝাউপাধিবিশিষ্ট পৌরোহিত্যব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। বোধহয় কৃত্তিবাসও ঐরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কৃত্তিবাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, আমি পুরাণ শুনিয়া গ্রন্থ রচনা করিলাম এবং তিনি ভাষাকবি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতাবতা অনেকে অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এ অনুমান অমূলক বলিয়া বোধহয়না। অসংস্কৃতজ্ঞ লোকেরাও যে, পাঁচজন ভাল লোকের নিকট জানিয়া শুনিয়া বিচিত্রশব্দবিন্যাসসমন্বিত গ্রন্থাদি রচনা করিতেপারেন, তাহা দাশরথিরায় ও ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ দুই কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এক্ষণকার অনেকেই জানেন; কিন্তু উহাঁদের রচনা, দেখিয়া বিবেচনা করিতে গেলে কেহই উহাঁদিগকে অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতে পারিবেন না। কৃত্তিবাসের স্বমুখে পরিচয়দানব্যতিরিক্ত তাঁহার অসংস্কৃতজ্ঞতাবিষয়ে এই এক

প্রধান প্রমাণ পাওয়াযায় যে, তাঁহার গ্রন্থের সহিত বাল্মীকি-রচিত মূলরামায়ণের অনেক অনৈক্য, অথচ তিনি যে, বাল্মীকিকে অবলম্ব না করিয়া অন্যকোন রামায়ণ অবলম্ব করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয়না; যেহেতু তিনি কথায় কথায় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন কবি একটা কিছু মূল অবলম্বন করিয়া তাহাতে নিজনৈসর্গিক কবিত্ব-সম্ভূত নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে তাহা বোধহয়না। যেহেতু বাল্মীকির মত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি বাল্মীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন ইহা দেখিয়া তাঁহার সংস্কৃতানভি-জ্ঞতাবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। ভাষারামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে এই বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়াযায়—বাহুল্য ভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

১মতঃ—কৃত্তিবাস, বাল্মীকির মত বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন—

> "রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
> অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥ ইত্যাদি।

বোধহয় তাঁহারই এইরূপ লেখাতে দেশমধ্যে "রাম না হতে রামায়ণ" এই কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাল্মীকি, স্বরচিতগ্রন্থের কোনস্থলে এমন কথা লেখেন নাই; বরং

মূল রামায়ণে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লেখাআছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে মূলরামায়ণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক। তাহার প্রারম্ভে এইরূপ আছে যথা—

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকি মুনিপুঙ্গবং॥
কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্। ইত্যাদি

"তপস্বী বাল্মীকি, বেদাধ্যয়ননিরত বাগ্মী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বর্ত্তমানকালে এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্ বীর্য্যশালী (ইত্যাদি) আছেন" ইত্যাদি। নারদ এই প্রশ্ন শ্রবণকরিয়া কহিয়াছেন মুনে! এরূপ গুণসম্পন্ন লোক সংসারে অতি দুর্লভ; তথাপি সেরূপ মনুষ্য যিনি আছেন, তাঁহার বিষয় শ্রবণ কর। এই বলিয়াই কহিয়াছেন—

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ইত্যাদি

তমেবংগুণসম্পন্নং (রামং) দশরথঃ সুতং। যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ॥ তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা-ভার্য্যাঽথ কেকয়ী। পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বর মেনমযাচত॥ ইত্যাদি

"ইক্ষাকুবংশসম্ভূত রাম নামে বিখ্যাত রাজা আছেন" অনন্তর নারদ রামের ভূরি প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছেন "এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র রামকে রাজাদশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দত্তবরা তাঁহার ভার্য্যা কেকয়ী সেই অভিষেকসামগ্রী সন্দর্শন করিয়া রাজার

নিকট পূর্ব্বদত্ত সেই বর প্রার্থনাকরিলেন” ইত্যাদিরূপে রাবণবধ ও রামের রাজ্যপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত রামায়ণের সমুদয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ‘ঐচ্ছৎ’ ‘অযাচত’ এইরূপ অতীতকালের ক্রিয়াপদপ্রয়োগদ্বারাই বর্ণনাকরিয়াছেন; কেবল রামের রাজ্যপ্রাপ্তির উত্তরকালীন কার্য্যসকল——যথা—

‘ন পুত্রমরণং কেচিদ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ কচিৎ।’
‘নার্য্য শ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥’
‘দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানিচ।’
‘রামো রাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যতি॥”

“ বামরাজ্যকালে কেহ কখনও পুত্রের মরণ দেখিবে না—নারীগণ কখন বিধবা হইবে না—রাম ১১ হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন”—ইত্যাদি ‘দ্রক্ষ্যন্তি’ ‘ভবিষ্যন্তি’ ‘প্রয়াস্যতি’ এইরূপ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দর্শন করিয়া রামায়ণতিলকনামক টীকার রচয়িতা বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৯০তম শ্লোকের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

অনেন রাবণবধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকে র্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে।

“ইহা দ্বারা রাবণবধের পর রামের রাজ্যকালে বাল্মীকি নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে”। যাহাহউক, এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এই এককথা বলিলেই হইবে যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির মত বলিয়া “ রাম জন্মিবার ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ” এই কথা যে, লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বাল্মীকির মত নহে। কবির

সংস্কৃতভাষায় বিশেষ অধিকার থাকিলে বোধহয় এরূপ ভ্রম হইত না। ফলতঃ রামায়ণের এইরূপ ভবিষ্যদ্বাকথন বাল্মীকীয়ে, অধ্যাত্মরামায়ণে, বা অদ্ভুতরামায়ণে কোথাও নাই; কেবল পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডের ৮৪তম অধ্যায়ে শুকসারিকার উক্তিতে লিখিত আছে।

২য়তঃ—লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা রাবণকে অন্যান্য বর দিয়া শেষে কহিতেছেন—

মর্ম্মে যবে ব্রহ্মঅস্ত্র পশিবে তোমার। তখনি রাবণ তুমি হইবে সংহার॥ অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে। তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে॥ সৃজিত করেছি আমি সেই ব্রহ্ম বাণ। ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥ বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন। স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকেতে কন॥ ইত্যাদি।

ঐ প্রসঙ্গেই আবার——

পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকের মতে॥ বিভীষণ কহিলেন রাবণগোচরে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥

ইত্যাদি উক্তির পর বিভীষণের উপদেশে ছলনাপূর্ব্বক মন্দোদরীর নিকট হইতে হনূমান কর্ত্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শরদ্বারা রাবণবধ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে একথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তথায় এইমাত্র লিখিত আছে যে, ইন্দ্রসারথি মাতলির উপদেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া রাবণের বধ সম্পাদন করেন।

৩য়তঃ—হতাহত বানর সৈন্যের সজীবতাসম্পাদনার্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে হনুমান দ্বারা ঔষধ আনয়ন করাইবার প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকিরচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অদ্ভুতরামায়ণের কোনস্থলে এই ঔষধানয়নের বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ নাই! এদিকে বাল্মীকিরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৪৩ তম সর্গে ইহার সবিস্তরবর্ণন আছে।

এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রজিৎবধের পর মহীরাবণ ও অহিরাবণবৃত্তান্ত, গন্ধমাদনপর্ব্বত আনয়নসময়ে হনূমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাসলিখিত ভূরিভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকিরামায়ণের সহিত বিসম্বাদী। অতএব বোধহয়, কথকের মুখে রামায়ণ শ্রবণকরিয়া কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। "পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।" তাঁহার নিজের এই লেখাদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কথকেরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্যসম্পাদনার্থ নানাপুরাণের বিবরণ একত্র সম্বদ্ধ করিয়াথাকেন—ইনিও বোধহয় সেইরূপ করিয়াছেন। ইহাঁর গ্রন্থের আদিকাণ্ডের প্রথমভাগে কালিদাসের রঘুবংশবর্ণিত অথবা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডবর্ণিত উপাখ্যানের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। তদতিরিক্ত তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানগুলি যে, অমূলক অর্থাৎ কোন না কোন রামায়ণে নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতেপারাযায়না।* রামের চরিত্রটী এমনই মধুর যে,

পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই উহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—সকলেই কোন না কোন প্রসঙ্গে রামচরিতটী বর্ণনকরিয়াছেন এবং তত্তৎস্থলে কেহ কেহ উপাখ্যানাংশে কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ নূতনতাযোগও করিয়াছেন। ভবভূতি, জয়দেব, মুরারি প্রভৃতি সংস্কৃতনাটককারেরাও ঐরূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহাহউক পুরাণ ও উপপুরাণের সঙ্খ্যা অনেক—সুতরাং তৎসমস্ত পাঠকরিয়া ভাষা রামায়ণের বাল্মীকিবিরুদ্ধ কোন্ কোন্ অংশের সহিত কোন্ কোন্ পুরাণের একতা আছে, তাহা প্রদর্শনকরা কঠিন। এমন কি, সকলপুস্তকই সংগৃহীত হইবার সুবিধা নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাল্মীকি-রামায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, ভারতান্তর্গত ও পদ্মপুরাণান্তর্গত রামোপাখ্যান এই কয়েকখানি ভিন্ন রামচরিতবিষয়ক আর কোন গ্রন্থই দেখিতে পাইনাই।

যাহাহউক এস্থলে আর একটী কৌতুককর কথা উপস্থিত হইতেছে। আমাদের একটী গল্প শুনাআছে যে, একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করিয়া আপন ভবনে রামায়ণ পাঠ করেন এবং পাঠান্তে নিতান্তক্ষুণ্ণমনে ঐ কার্য্যকরণজন্যপাতকের প্রতীকারার্থ রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করেন! ইহাতে লোকে বিস্মিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "আমি গঙ্গাজল ও তুলসী হস্তে লইয়া 'তপঃ-

স্বাধ্যায়নিরতং’ ইত্যাদি ‘তদ্ব্রহ্মাপ্যনুমন্যত’ ইত্যন্ত মহর্ষিবাল্মীকিপ্রোক্ত সমস্তরামায়ণ পাঠকরিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—কিন্তু পাঠক ও ধারকের সমুদয়ে তিন খান পুস্তক ছিল—ঐ তিন পুস্তকেরই স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ ন্যূনাধিক্য ও বিপর্য্যয় যে, পরস্পরের কিছুমাত্র ঐক্য হয় নাই। আমার বোধ হইয়াছে যে, যদি আরও ২। ৩ খান পুস্তক সংগ্রহকরিতাম, তাহাদেরও পাঠের ঐরূপ অনৈক্য হইত। ঐ সকল পাঠের মধ্যে কোন্ পাঠ প্রকৃত, তাহার কিছুই বুঝিবার যো নাই—হয়ত আমাদের সংগৃহীত তিন পুস্তকেই বাল্মীকিরচিত প্রকৃতপাঠের অনেক ন্যূনতা আছে —তাহা হইলে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য!” ফলতঃ রামায়ণের পাঠসকল বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, “কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ মারভন্তে” এই ন্যায়ে ভাষারামায়ণেও কি ঐ বিপর্য্যাস উপস্থিত হইবে! আমরা এই কার্য্যপ্রসঙ্গে কয়েকখানি ভাষারামায়ণ সংগ্রহকরিয়াছি, তাহার একখানি খৃঃ ১৮৩৩ অব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বারমুদ্রিত ও অপরগুলি ভিন্নভিন্ন সময়ে কলিকাতায় মুদ্রিত। এই সকল পুস্তকের পাঠও স্থানে স্থানে কিছুমাত্র মেলে না!—বিশেষতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে ঐ সকল পুস্তকের পাঠ একেবারে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। এমন কি, শ্রীরামের

ভগবতীপূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতির প্রস্তাব শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই। উত্তরকাণ্ডেও সীতাবনবাসকালে শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকসকলে অনেক অধিক আছে। কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠগুলি পরস্পর অধিক বিভিন্ন নহে। কিন্তু উহাদের সহিত শ্রীরামপুরমুদ্রিতের পাঠসকল অনেকস্থানেই যারপর নাই বিসম্বাদী।

ইহার কারণ কি? সংস্কৃতরামায়ণের ভাষা অতি সহজ, এজন্য অনেকে স্বরচিত ২। ৪টী শ্লোক উহার মধ্যে মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন—সেই কারণেই রামায়ণের অনেকস্থলেই পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে, এই কথা এক্ষণে অনেকে বলিয়াথাকেন। ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রম-কারণেও কি ঐরূপ কথা বলিতেপারাযায়? আমাদের বোধে ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রমের কারণ উহা নহে। কেহ কেহ যে, বলিয়াথাকেন 'এক্ষণকার মুদ্রিত রামায়ণসকল ৺ জয়গোপালতর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত'—তাহাতে আমাদের বোধহয় উহা কেবল তাঁহার সংশোধিত নহে, ভিন্নভিন্ন সংস্করণ ভিন্নভিন্ন লোকের সংশোধিত। সংশোধকেরা আপনাদিগের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—এবং সেই জন্যই এই প্রকার নানারূপ পাঠভেদ হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় মুদ্রিতরামায়ণ সমস্তই কাহারও না কাহারও

সংশোধিত—উহার একখানিও কৃত্তিবাসের আসলরচনা নহে। কিন্তু দেখাযাইতেছে, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠ প্রায় একরূপই, কেবল শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকের পাঠই অনেক বিভিন্ন। অতএব এই সিদ্ধান্ত করাযাইতেপারে যে, শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকই পণ্ডিতপ্রবর তর্কালঙ্কারমহাশয়ের সংশোধিত। এই পুস্তকের পাঠে ছন্দোভঙ্গাদি দোষ তত নাই; রাবণবধস্থলে বাল্মীকির মতই অনুসৃত হইয়াছে; এবং কৃত্তিবাস যে যে স্থলে অন্যান্য রামায়ণের মত লিখিত হইল, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, অথচ তত্তৎরামায়ণে সেরূপ প্রসঙ্গ নাই—সেই সেই স্থল সাবধানতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বিবেচনাকরিয়া বিপরীতঅনুমানকরা সঙ্গত বোধহয়না। যাহাহউক, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, উক্তরূপ সংশোধনদ্বারা আসল নকল সমুদয় মিশিয়াগিয়াছে, উভয়কে পৃথক্ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে এবং কালক্রমে ঐ নকলই থাকিবে—আসল একেবারে লুপ্ত হইবে। অতএব ঐ সংশোধনদ্বারা গ্রন্থের গৌরবের হ্রাস বৈ বৃদ্ধি হয় নাই।

যাহাই হউক—কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানুন বা নাই জানুন—মূলরামায়ণের সহিত তাঁহার রচনার ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ডরামায়ণ বহুলনীতিগর্ভ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি লোকের মুখে পুরাণ শুনিয়াই

যদি এতাবৎ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াথাকেন, ইহাতে তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নাই। তিনি যৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে এরূপ ছন্দোবদ্ধ কাব্য অধিক ছিলনা। সুতরাং তিনি অন্যের অনুকৃতি অধিক করিতে পান নাই;—তাঁহার রচনা নিজনৈসর্গিকশক্তিসম্ভূত। ভারতচন্দ্র ইদানীন্তনকালে মালিনীর বেসাতি পরিচয়দানস্থলে যেরূপ শব্দচাতুর্য্য প্রকাশকরিয়াছেন, কৃত্তিবাস তত প্রাচীনসময়েও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। ভরদ্বাজাশ্রমে বানরদিগের ভোজনসময়ে তিনি লিখিয়াছেন—

অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্যপেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচূর। যাহা নিরখিবামাত্র হয় মতি চূর॥
নিখুঁতি নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥ ইত্যাদি।

অঙ্গদরায়বারেও তিনি সামান্য পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরেন নাই। অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য রাক্ষসীমায়ায় সভাশুদ্ধ সমস্ত লোকেই রাবণরূপ ধারণকরিল, কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণকরা অনুচিত, বিবেচনাকরিয়া নিজরূপেই রহিলেন, ইহা দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধ ও পরিহাসসহকারে তাঁহারেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অঙ্গদ বলে সত্যকরে কওরে ইন্দ্রজিতা। এই যত বসে আছে সবাই কি তোর পিতা॥ ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥ কোন্ বাপ তোর চেড়ীর

অন্ন খাইল পাতালে। কোন্ বাপ বাঁধাছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥ কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গ্‌তে গেছিল মিথিলা। কোন্ বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা॥ কোন্ বাপ জব্দ হলো জামদগ্ন্যের তেজে। মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥ একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা। ইহা সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপটী কোথা॥

অনন্তর নানাবিধ কথোপকথন হইলে রাবণ কুপিত হইয়া কহিলেন, সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়াদিলে, বিভীষণ আসিয়া শরণাপন্ন হইলে,—হনুমানকে বাঁধিয়া এই স্থানে আনিয়াদিলে, এবং রামলক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, আমি কোনরূপে ক্ষান্ত হইতে পারি। ইহা শুনিয়া—

অঙ্গদ বলিছে রাবণ আমরা তাই চাই। কচ্‌কচিতে কাজ্‌কি মোরা দেশে চলে যাই॥ রামকে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়। সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥ বিভীষণে বান্ধিয়া আনিব তোর কাছে। বুঝিয়া করহ শান্তি মনে যত আছে॥ নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া। শূর্পনখার নাক কাণটী কেমনে দিব জোড়া॥

নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে কবির সহৃদয়তারও বিলক্ষণ পরিচয় হইবে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥ কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥ মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥ গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। তথাকি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥ পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া। রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥ চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥ রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা। হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥ রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। রাজলক্ষ্মী তথাপি

ছিলেন সন্নিকটে ॥ আমার সে রাজলক্ষ্মী নিল কোন জনে। কৈকেয়ীর মনোহভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥ সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥ কমল লতার প্রায় জনক দুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥ দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ ॥ তারা না হরিতে পারে তিমির আমার। এক সীতা বিহনে সকলই অন্ধকার ॥ দশদিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে। সীতাবিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥ সীতাধ্যান সীতাজ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥ দেখরে লক্ষ্মণভাই কঁর অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥ আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান। সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥ তাহার উচিত ফল দিলেছে আমারে। শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে ॥ শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসের সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেই বোধহয় দেশমধ্যে (পঞ্চালী) পাঁচালি নামক গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী বাদ্য ও স্বর সংযোগে গানকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস সেইরূপ পাঁচালীর অনুকরণেই ভাষারামায়ণের রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রচনাকে গীত, পাঁচালী ও নাচাড়ী বলিয়া উল্লেখকরিয়াছেন। নাচাড়ী শব্দটী বোধহয় পাঁচালীরই অপভ্রংশ হইবে। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিতপুস্তকে দেখাযায়, ত্রিপদীস্থলেই নাচাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাহউক বোধহয়, গীতের অনুরোধেই তাঁহার রচিত শ্লোকগুলিতে অক্ষরগণনার ও যতির নিয়ম তত অনুস্থত হয়নাই। ইদানীন্তনকালীন দাশরথি রায় প্রভৃতির রচিত পাঁচালীর ন্যায় উঁহাতেও ঐ নিয়মের

বহুল বৈষম্য দৃষ্টহইয়াথাকে। ফলতঃ তিনি যে উদ্দেশে ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। শত সহস্র লোকে চামরমন্দিরাসহযোগে রামায়ণগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। আধুনিক কত রামযাত্রার পালা ঐ রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে, রামায়ণের উপাখ্যান কহিতেপারে, ভাষারামায়ণই তাহার মূল কারণ। যাহার কিছুমাত্র অক্ষরপরিচয় আছে সেই, রামায়ণ পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য দোকানদারেরাও ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলেই তারস্বরে রামায়ণপাঠ করিয়াথাকে। এরূপ সৌভাগ্য সকল কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

রামায়ণের ভাষা আদ্যোপান্ত সুমধুর ও ব্যাকরণানুসারে সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ না হউক, সকলস্থলেই যে, কবির মনোগতভাবের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। ভাষার দুরূহতা বা জটিলতা দোষে ভাবগ্রহ করিতে পারাযায় না—সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। ইহাঁর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেক কবির রচনায় এরূপগুণ লক্ষিতহয়না।

ভাষারামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদীভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই। তবে কলিকাতামুদ্রিত একখানি পুস্তকে অকম্পনের যুদ্ধের পর, বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধস্থলে ‘নর্ত্তকছন্দ’ নামে একটী নূতন ছন্দ দেখিতেপাওয়াযায়; কিন্তু কলিকাতামুদ্রিত অপরাপর পুস্তকে ও শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে ঐ প্রস্তাবটী

একবারে নাই, এবং ছন্দটীও—

" তবে দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে, প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী, করেতে ধরি, রহে সুখীমন ॥ " ইত্যাদি

নিতান্ত আধুনিকত্বগন্ধী—অতএব বোধহয় ঐ প্রস্তাব কৃত্তিবাসের রচিত নহে—উহা কোন আধুনিক কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে ত্রিপদী ও পয়ার ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ঐ দুই ছন্দ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ দুই একটী ছন্দও দেখিতেপাওয়াযায় যথা—

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসরচিত রামায়ণভিন্ন আরও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিতেপাইয়াছি, তাহার একখানির নাম 'যোগাধ্যার বন্দনা' ও অপর খানির নাম ' শিবরামের যুদ্ধ '। দুই খানিতেই কৃত্তিবাসের ভণিতি আছে। রচনাদর্শনেও তাঁহারই লেখনীনির্গত বলিয়া বোধহয়।

কবিকঙ্কণ—চণ্ডী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা নামক গ্রামে চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল। তিনি রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠসহোদরের নাম কবিচন্দ্র। চণ্ডীর ভণিতিতেই এই পরিচয় দেওয়াআছে যথা—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কবির প্রকৃতনাম মুকুন্দরাম; মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী তাঁহার বংশীয় উপাধি—অলৌকিককবিত্বশক্তিসন্দর্শনজন্য তাৎকালিক জনগণের প্রদত্ত উপাধি—কবিকঙ্কণ। বোধহয় তাঁহার অগ্রজেরও কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে—উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের কবিত্বপ্রদর্শক আর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। কেবল শিশুবোধকের মধ্যগত দাতাকর্ণে—

"দ্বিজকবিচন্দ্র গায় ব্যাসেরকৃপায়। ধনপুত্র হয় তার যেজন গাওয়ায়॥

এই ভণিতিদর্শনে এরূপ অনুমান করাযাইতেপারে যে, ঐ প্রবন্ধ কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রেরই রচিত। কোন কোন প্রাচীনপুস্তকে চণ্ডীর মধ্যেও কবিচন্দ্ররচিত একটী সূর্য্যবন্দনা দেখিতেপাওয়াযায়।

যাহাহউক, মুকুন্দরাম যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থার প্রথমে দুরাত্মা যবনদিগের অসহনীয় উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পিতৃপৈতামহ বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে দেশান্তরযাত্রা করেন, এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যস্থিত আঁড়্‌রা নামক গ্রামের ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা বাঁকুড়াদেব (বা বাঁকুড়ারায়) মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্র রঘুনাথরায়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী করিয়া দেন। মুকু

ন্দরাম রাজদায় ও অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথায় সুখে অবস্থান করত এই কাব্যগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের প্রথমভাগেই ঐ বৃত্তান্তের বর্ণন আছে—যথা———

শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাস চসি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপাদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকলসমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদসরিফে॥
উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি। মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া, নাহিমানে প্রজার গোহারি॥ সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় ধুতি। পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥ ডিহিদার আরোজখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে। প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥ কোতালিয়া বড় পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে। আথালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দেড়ি, যত দিয়া যেবা নিতে পারে॥ জমাদার বসায় নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা। প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীগড় যাঁর গাঁ, যুক্তি করি গম্ভীর খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হৈল তার সনে॥
তেলিগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় কৈল হিত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউটায় হৈনু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোথড়া নগরে।
তেল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয়ি পুখুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
গোথড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, আঁড়রায় গিয়া উপনীত॥
আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, রাজা দিলা দশ আড়া ধান॥
বীর মাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত, শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।
হাতে করি পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আঁদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মম ভাষা করিও কুশল॥

উপরিলিখিত সন্দর্ভটী মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডীহইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ, আঁড়রাগ্রামের যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে ২ ক্রোশদূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার ডেপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরিউক্ত সন্দর্ভটী সমুদায় লেখাইয়া আনিয়াদিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতেগ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে বহুল অংশে বিশোধিতহইয়াছে।

ঐ পুস্তকের পাঠসকল দেখিতে পাইয়া আমাদের অনেকগুলি সংশয় অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ মুদ্রিত পুস্তকস্থ "উপনীত কুচুট নগরে" এই লিখনদ্বারা মুকুন্দরামের দামুন্যাহইতে আঁড়রা গমনসময়ে পথিমধ্যে কুচুট গ্রামপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে—কিন্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত হয়না—কারণ কুচুট (কালেশ্বর) দামুন্যাহইতে অনেক দূর উত্তরদিকে অবস্থিত—আঁড়রা সে দিকে নহে—দক্ষিণ দিকে। সুতরাং দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকে যে, কুচুটের পরিবর্ত্তে গোথড়াগ্রাম লিখিত আছে, তাহাই সঙ্গতবোধহয়।

২য়তঃ—মুদ্রিতপুস্তকে 'সুধন্য বাঁকুড়ারায়' এইরূপ একটী চরণ আছে—তৎপাঠে অনেকের ভ্রমহইয়াছে যে, ব্রাহ্মণভূমি পরগণা ও তদন্তর্গত আঁড়রা গ্রাম, বাঁকুড়া জেলার মধ্যে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মেদিনীপুরজেলার মধ্যগত এবং বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়ারায় রঘুনাথদেবের পিতার নাম। উপরিউল্লিখিত পুস্তকের এবং আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে।

এক্ষণে চণ্ডীকাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়করা আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের শেষঅংশটী পাওয়াযায়নাই—সুতরাং তাহাতে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা ছিল কি না, জানিবার যো নাই। আমরা আরও ৫।৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীনপুস্তক সংগ্রহ করিয়া-

ছিলাম; সে সকল পুস্তকের কুত্রাপি সময়সূচক শ্লোক নাই। কিন্তু এক্ষণকার মুদ্রিতপুস্তকের শেষভাগে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়াযায়—যথা

শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকের অর্থ লোকে সচরাচর ১৪৬৬ শক [১৫৪৪খৃঃঅব্দে] করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কবির নিজলিখিত মানসিংহের রাজত্বকালবর্ণন সঙ্গত হয়না। কারণ মানসিংহ ১৫১১ শকে [১৫৮৯ খৃঃঅব্দে] এদেশের নবাবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৬৬ শকের ৪৫ বৎসরপরে যে মানসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণন ১৪৬৬ শকে হওয়া সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। এই অসঙ্গতিনিবারণার্থ কেহ কেহ "শকে রস রস বেদ" এই পাঠকে ভ্রান্ত বলিয়া "শকে রস রস বাণ" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয়না। যেহেতু ১৫৬৬ শকেও [১৬৪৪ খৃঃঅব্দে] মানসিংহ এদেশের অধিপতি ছিলেন না। তিনি ১৫২৬ শকেই [১৬০৪ খৃঃ অব্দে] আপনার আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহাহউক আমাদের বোধহয় "শকে রস রস" ইত্যাদি শ্লোক কবিকঙ্কণের স্বরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক হইবে। তাহা না হইলে আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কোন না কোন পুস্তকে উহা দেখাযাইত। যখন্ তাহা দেখাযাইতেছে না এবং যখন্

উহাদ্বারা প্রকৃতসময়ের নির্ণয় হইতেছে না, তখন্ উহাকে কল্পিতপাঠ বৈ আর কি বলাযাইতে পারে? যাহাহউক, আমরা চণ্ডীকাব্যের সময়নির্ণয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায় পাইয়াছি। আমাদের পরমসুহৃৎ মেদিনীপুরের ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবুরামাক্ষয়চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথরায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলীপ্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত রাজবাটী হইতে সংগ্রহকরিয়া লিখিয়াপাঠাইয়াছেন। তদ্দ্বারা জানাযাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথরায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কবিকঙ্কণ, রাজারঘুনাথের রাজত্বকালে ও তাঁহারই উৎসাহে যে, কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের মধ্যে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। উপরি ভাগে যেরূপ উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, রাজা মানসিংহের রাজত্বও ঐ সময়মধ্যেই হইয়াছিল।

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি কেহ "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" ইত্যাদি শ্লোককে সমূলক বলিতে নিতান্তই ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে আমরা ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিব—যথা, 'রস' শব্দে যেরূপ ৬ বুঝায়, সেইরূপ ৯ও বুঝাইতেপারে, অতএব 'শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা'

ইহার অর্থ ১৪৬৬ শক নাহইয়া ১৪৯৯ শক হইবে। ১৪৯৯ শকে রঘুনাথরায় রাজা ছিলেন—তৎকালে ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি বল ১৪৯৯ শকেও মানসিংহের অধিকার হয় নাই—তাহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১১ শকে হইয়াছিল, স্থতরাং ১৪৯৯ শকে লিখিত গ্রন্থের সূচনায় মানসিংহের রাজত্ববর্ণন কিরূপে সঙ্গত হয়? এ কথার উত্তরে আমরা এই বলি যে, ঐ ১৪৯৯, গ্রন্থের আরম্ভকালের শক—সমাপ্তিকালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আঁড়রানগরে অবস্থানপূর্ব্বক চণ্ডীরচনার আরম্ভ করিয়া ১২ | ১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন্ মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে স্থবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়াথাকিবেন এবং এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্ত করিয়া শেষে বিজ্ঞাপন লিখিয়াথাকেন, বোধহয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থরচনা সমাপনের পর পরিশেষে গ্রন্থোৎপত্তির সূচনাভাগটী লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক যখন্ ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের পূর্ব্বে ৩০ বৎসরের মধ্যে কোনসময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যরচনা করিয়াছিলেন, এরূপ স্থিরতর সংবাদ পাওয়াযাইতেছে, তখন্ এ বিষয়ের জন্য আর তর্ক বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা দুইটীর নাম চিত্ররেখা ও যশোদা। কবিকঙ্কণের বংশীয়েরা দামুন্যা গ্রামে কেহ নাই;

তাহার নিকটবর্ত্তী 'বৈনান' গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের অনেকে অদ্যাপি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায় করিয়াথাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কবি-কঙ্কণ হইতে কয় পুরুষ অন্তর? তাহা প্রায় কেহই বলিতে পারেন না। ইহাঁদের বাটীতেও আল্‌তায় লিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে—সে খানির পূজা হয়। ইহাঁরা বলেন সে খানি কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত।

কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরাও পূর্ব্বোল্লিখিত সেনাপতে গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য নাই—বর্দ্ধমানেশ্বর সমুদায় কাড়িয়া লইয়াছেন। রঘুনাথরায় হইতে ১০ম পুরুষ (বর্ত্তমান) শ্রীযুক্তরামহরিদেব, সেনাপতেগ্রামের কালেক্টরীর খাজনা-বাদ যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দ্বারাই কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গণেশ লক্ষ্মী চৈতন্য রাম প্রভৃতির বন্দনাকরিয়া সংস্কৃতপুরাণরচনার অবলম্বিত রীতি অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, হৈমবতীর বিবাহ, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের জন্মপ্রভৃতি বর্ণনপূর্ব্বক ভগবতীর পৃথিবীতে পূজাপ্রচারোদ্দেশে কালকেতুব্যাধের ও শ্রীমন্তসওদাগরের দুইটী বৃহৎ উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠকরিলে তিনি যে, সংস্কৃতশাস্ত্রে একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী লোক ছিলেন,

তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। গৌরীর রূপবর্ণন, নারদকৃত সম্বন্ধ, তারকাসুরপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মসমীপে-গমন, শিবতপস্যা, মদনদহন, রতিবিলাপ, পার্ব্বতীতপস্যা, হরানুগ্রহ ও হরগৌরীবিবাহপ্রভৃতি, কালিদাসরচিত কুমার-সম্ভবের অনুকৃতিস্বরূপ হইলেও উহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের ভিক্ষা ও হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি তাঁহার নূতন রচনা। এই গ্রন্থস্থ কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি সওদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত? কি ইহার কোন না কোনরূপ পৌ-রাণিক মূল আছে? তাহা স্থির বলিতে পারাযায়না। কিন্তু কবির লেখার ভঙ্গীতে বোধহয় যে, কোন পুরাণ বা উপপুরাণে ইহার কিছু না কিছু মূল থাকিবে। যে হেতু তিনি মধ্যে মধ্যে “বিচারিয়া অনেক পুরাণ” এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতুর উপাখ্যান এবং কল্কীপুরাণে শ্রীপতিসওদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতেপাইলাম না। যাহাহউক চণ্ডীকাব্য এক্ষণে প্রায় রামায়ণ মহাভারতাদির ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে গণ্য হইয়াছে; অনেক শাক্তে নিয়মিতরূপে এই গ্রন্থের পূজা ক-রেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ লইয়া কত কত যাত্রার পালা প্রস্তুত হইয়াছে; কত কত গায়কে চামরমন্দিরাসহযোগে চণ্ডীগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিযাছে ও করিতেছে

এবং কত লোকে ধর্ম্মবোধে সংকল্প করিয়া ঐ গীত বাটীতে গাওয়াইতেছে। সুতরাং কাল্পনিক উপন্যাস হইলে লোকের ইহাতে এত শ্রদ্ধাহওয়া তাদৃশ সঙ্গত হয় না। যাহাহউক, সচরাচরপ্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার কোনরূপ উ-ল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায়, অনেকে ইহাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধকরেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীপর্য্যা-য়ের স্ত্রীলোকদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, সুবচনীর কথা, মঙ্গলচণ্ডীর কথা প্রভৃতি অনেককথা শুনিয়াছি; সেই সকল কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। অতএব আমাদের বোধহয়, কবি স্বদেশপ্রচলিত তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি এই সুরম্যহর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

কবিকঙ্কণ বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। ইতিপূর্ব্বে আমরা যেযে কবির নামোল্লেখ করিয়াছি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে তাঁহাদের কেহই কবিকঙ্কণের তুল্যকক্ষ নহেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে, এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে, এত শ্রদ্ধা আছে—কিন্তু চণ্ডীপাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে, সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়াযায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘকবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপালবধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের

রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা, বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপ-ভ্রষ্ট নায়কনায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অ-ক্ষরে স্তব, ঝড়বৃষ্টিদ্বারা দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাসবর্ণন, সুপুরুষদর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাঁট করার পরিচয় দেওয়া, ইত্যাদি ভূরি ভূরি বিষয় এবং ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দসকল ভারতচন্দ্র যে, চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারাযায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে২ আদিরসের যেরূপ ছড়াছড়ি করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ মোটে করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তত্তৎস্থলে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিক কামিনীরা নিজ নিজ পতির নিন্দাকরণাব-সরে কি জঘন্য মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল? কিন্তু মনোহরবেশধারী শিবকে সন্দর্শনকরিয়া ওষধিপ্রস্থবিলাসি-নীরাও দুঃসহদুঃখাবেগে স্ব২ পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন করেনাই—বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিব্রত্যপক্ষই সমর্থন করিয়াছিল। ইহা কবির সামান্য বিমলরুচিতার কার্য্য নহে।

কবিকঙ্কণ, চণ্ডী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতির ভূরি২ উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ এবং ভারতবর্ষস্থ নানাদেশের নদ নদী গ্রাম নগর অরণ্য প্রভৃতির কতই বর্ণন করিয়াছেন! এবং পশু পক্ষী ও নানাপ্রকৃতিক নানাধর্ম্মী নানাজাতীয় লোকের বিভিন্নপ্রকার স্বভাবগুলি কি সুন্দররূপেই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! ঐ সকল চিত্রে একের রঙ্ অপরের গাত্রে প্রায় কোথাও সংলগ্ন হয়নাই—সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রঙবিশিষ্ট। কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই পৃথগ্‌বিধ বর্ণে রঞ্জিত। ফলতঃ বাঙ্গালাকবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতেপাওয়া যায়না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দারিদ্র্যবর্ণনসময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন করিয়াছেন। ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারিশীলবণিকের বঞ্চকতাবর্ণনে তিনি সাধারণক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে প্রচুর পরিহাস রসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক জগজ্জননী ভগবতীর কঞ্চুলিকামধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড চিত্রিত হওয়ায় কবির কি অলৌকিক প্রগাঢ় ভাবুকতাই প্রকটিত হইয়াছে! তদ্ভিন্ন অন্তঃসত্ত্বার মানসিক অবস্থা, বৈবাহিক আচারপদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর ঔষধকরণ, সপত্নীকলহ, রন্ধন, পাশক্রীড়া, এবং অগ্রে সম্মান পাই-

বার জন্য বণিক্‌দিগের বাগ্বিতণ্ডাপ্রভৃতির বর্ণনস্থলে কবির লোকব্যবহারাভিজ্ঞতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি যে দুইটী উপাখ্যান বর্ণনাকরিয়াছেন, তাহার একটীর অধিষ্ঠানভূমি কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টীর বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী থানামঙ্গলকোটের সন্নিহিত অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। তন্মধ্যে কলিঙ্গদেশ কবির বাসভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; তথায় বোধহয় তিনি স্বয়ং কখনই গমন করেন নাই এবং তথায় গমন করিয়াছে, এরূপ কোন লোকের সহিতও বোধহয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়নাই। সুতরাং ঐ স্থানের ভৌগোলিক বিবরণে তাঁহার অনেক ভ্রম হইয়াছে। তিনি গুজরাটনগরকে কলিঙ্গের অতিনিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গুজরাট এক্ষণে বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত। কিন্তু কলিঙ্গ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির মধ্যস্থ এবং পূর্ব্বোপকূলে স্থিত—উভয়দেশের অন্তর ৩শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহাহউক দ্বিতীয় অধিষ্ঠানভূমির ভৌগোলিকবিবরণ অনেকদূর পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে। মঙ্গল-কোটের নিকটে 'উজুনী' (উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটী স্থান বর্ত্তমান আছে। উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর উহার উপর কিছুই নাই। উহার সমীপে 'ভ্রমর' নামেও একটী খাল আছে; উহা অজয়নদের সহিত সংযুক্ত। ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের অজয় বহিয়া সিংহলযাত্রার

সময়ে নদের উভয়কূলে হুসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উধনপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ আছে, অদ্যাপি তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, সওদাগরেরা গঙ্গার উভয়কূলবর্ত্তী ইন্দ্রাণীপরগণা, ললিতপুর (নলেপুর) ভাগুসিংহের (ভাওসিঙের) ঘাট, মেটেরি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মির্জাপুর, অম্বিকা (আম্বুয়া) শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, নিমাইতীর্থের ঘাট, মাহেশ, খড়দহ, কোণনগর, কোতরঙ্গ, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেলেঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, বারাশত (দক্ষিণ) খলিনা, ছত্রভোগ, হেতেগড়, মগরা প্রভৃতি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলও অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। বোধহয় কালসহকারে কোন কোন গ্রাম স্থানান্তরিত হইয়াছে—উলা বেলেঘাটা প্রভৃতি গ্রাম সকল এক্ষণে কবির বর্ণিতস্থানে দেখিতেপাওয়াযায়না। এস্থলে ইহাও বোধহইতেছে যে, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর সকল তৎকালে সমৃদ্ধ ছিলনা। কলিকাতা নগরীকেও লোকে যেরূপ আধুনিক মনে করে এবং ঐ আধুনিকত্বের প্রমাণস্বরূপ 'কালিকাটা' বৃক্ষের যেগল্প রচনা করে, তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধহয়না; কারণ এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণের সময়েও কলিকাতা বর্ত্তমানছিলএবং সে সময়ে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই।

আরও এস্থলে দেখাযাইতেছে যে, কবিকঙ্কণের সময়ে সপ্তগ্রামের নিম্নবর্ত্তিনী সরস্বতীর প্রবাহ মন্দ হইয়া হুগলীর সমীপবাহিনী গঙ্গার প্রবাহ প্রবল হইলেও সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংস ও হুগলীর তাদৃশী উন্নতি হয়নাই—হইলে কবি সপ্তগ্রামের অত সমৃদ্ধি বর্ণন করিতেন না এবং হুগলীর কথাও কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন। কলিকাতার দক্ষিণ খিদিরপুর ও কালীঘাটের নিকট দিয়া যে গঙ্গা গিয়াছে—লোকে যাহাকে এক্ষণে আদিগঙ্গা কহে—তৎকালে উহারই প্রবাহ প্রবল ছিল। কারণ কবি, মুচিখোলার নিম্নস্থ কাটিগঙ্গাকে 'হিজ্‌লির পথ' বলিয়া পরিত্যাগ করত কালীঘাটের নিম্নস্থ গঙ্গাদিয়াই সওদাগরদিগের নৌকাগুলি চালাইয়াছিলেন। যাহাহউক তৎপরে মগরা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত পথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ পথিমধ্যস্থ যে সকল স্থান ও হ্রদাদির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার সমুদয় বাস্তবিক বলিয়া বোধহয়না। বোধহয় কবি—

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহেযায় হারামদের ডরে॥

এই উক্তিদ্বারা পূর্ব্বদক্ষিণাঞ্চলস্থিত পোর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গীশব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তৎকালে অত্যন্ত উপদ্রব করিত বলিয়া তাহাদিগকে 'হারামদ' অর্থাৎ (পারসিভাষায়) দুষ্ট লোক বলিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গীর দেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রে গমন সময়ে পথিমধ্যে পুরী অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তিস্থান পা-

ওয়া, কালিয়াদহ নামক হ্রদে উপস্থিত হওয়া ও তথায় কমলে কামিনী সন্দর্শন করা প্রভৃতি অনেক রমণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা এক্ষণে একই দ্বীপকে সিংহল বা লঙ্কা বলিয়াথাকি, কিন্তু কবির সেরূপ বোধ ছিলনা—তিনি উহাদিগকে পৃথক্ দ্বীপ বোধ করিতেন। যাহাহউক তত প্রাচীন সময়ে অত দূরবর্ত্তী দেশের ভৌগোলিকবিবরণবর্ণনে ভ্রম হইলেও কবির কবিত্বের হানি হয়না। প্রাচীনকালের অনেক কবিরই ওরূপ ভ্রম হইয়াছে। বানরদিগকে সীতার অন্বেষণার্থ দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিবার সময়ে মহর্ষি বাল্মীকিও সেরূপ ভ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইতেপারেন নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যাহাছিল, তাহারও অনেক বিবরণ জানিতে পারাযায়। এক্ষণে রাঢ়ীয় কুলীনসন্তানদিগের যেরূপ বহুবিবাহ আছে, পুনর্ব্বিবাহের সময়ে যেরূপ কুৎসিতক্রিয়াকাণ্ড আছে, এবং পুরাণের যেরূপ কথকতা করা আছে, কবিকঙ্কণের সময়েও এসকলই প্রায় এইরূপই ছিল, অধিকন্তু পাশক্রীড়াটী সেসময়ে বোধহয় কিছু অধিক ছিল। কবি অনেকস্থলেই, এমনকি, স্ত্রীজাতির মধ্যেও ঐ ক্রীড়ার অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন। বোধহয় ঐ সময়ে কামিনীদিগের শাটী পরিধানকরা, অথবা অধোংশুকও উত্তরীয় ব্যবহারকরা দুই রীতিই কিছু কিছু ছিল। যেহেতু

কবি ঐ দুই রীতিরই বর্ণন করিয়াছেন। কাঁচুলি ব্যবহার বোধহয় তৎকালে অনেকেই করিত।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মকেতু, নীলাম্বর, কালকেতু, মুরারিশীল, ভাঁড়ুদত্ত, বিক্রমকেশরী, লক্ষপতি, ধনপতি, মালাধর, শ্রীমন্ত, শালবাণ, অগ্নিশর্ম্মা, নিদয়া, ছায়াবতী, রম্ভাবতী, দুর্ব্বলা, লীলাবতী, সুশীলা, জয়াবতী প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীগণের যে সকল কল্পিত নামধেয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের জাতি ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, ঐসকলনামও যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বোধহয়না। ইহাদেরও অনুরূপ অর্থ আছে—ফুল্লরা—ফুল্ল(=প্রফুল্ল=স্পষ্ট) রা(=রব) যাহার। মাংসবিক্রয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা আবশ্যক এবং ব্যাধজাতিতে অপভ্রংশশব্দসম্বলিত নাম থাকা গুণাবহ ভিন্ন সদোষ বোধহয়না, সুতরাং ফুল্লরানাম নিরর্থক নহে। খুল্ল শব্দ নখীনামক এক উৎকৃষ্টগন্ধদ্রব্যবাচক; তদ্বিশিষ্টা স্ত্রী—খুল্লনা; গন্ধবণিক্‌জাতীয় বালিকার গন্ধদ্রব্যসম্বলিত নামহওয়া অসঙ্গত নহে। লহনা শব্দে পারস্যভাষায় বিপদ্=দায়=ঝঞ্ঝাট;—ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার 'লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কোন ছন্দ, নাই বলি-

লেই হয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে ঐ দুই ছন্দ ব্যতিরিক্ত ঝাঁপ-তাল, ভঙ্গপয়ার, ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী এবং আরও ২।১টী নূতনরূপ ছন্দ আছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের ন্যায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু" ॥ "দিদি গো এবে বড় সঙ্কট পরাণ" ॥
"কোটাল! খানিক জীবন রাখ" ॥

ইত্যাদিরূপ ধুয়া এবং ধান্‌শী, কামোদ, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি অনেক রাগরাগিণীরও উল্লেখ মধ্যে মধ্যে আছে। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী ছন্দই পয়ার বা ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র —কোনটীই উহাহইতে ভিন্নপ্রকৃতিক নহে। অতএব বোধহয় কবি, পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে লিখিতেই, যদৃচ্ছা-ক্রমে অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়াও কর্ণে মিষ্ট লাগাতে, ঐ সকল নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যসকলের ছন্দে যতিভঙ্গ ও অক্ষরগণনার বৈষম্য প্রভৃতি যেসকল দোষ দৃষ্টহয়, চণ্ডীকাব্যের ছন্দেও সেসকল দোষ নাই এমত নহে, তবে অপেক্ষাকৃত বিরল বটে।

অনর্গল প্রশংসা করিলে লোকে গোঁড়া বলে এবং গোঁ-ড়ার কথায় কেহ শ্রদ্ধা করেনা; সুতরাং সে অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও চণ্ডীর ২।৪টি দোষের কথা বলিতে হইল। কবিকঙ্কণ, বর্ণিত নায়কনা-য়িকা প্রভৃতির চরিত্রগুলি প্রায় সকলস্থলেই য়থাযথরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী স্থলে তাহা-দের কার্য্য ও আচার ব্যবহার অত্যুক্তিদূষিত ও অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালকেতুব্যাধকে অত অধিক অন্ন-

ব্যঞ্জন নাদিয়া কিছু কম দিলে ভাল হইত। খুল্লনা, অতবড় ধনবান্ লোকের পত্নী হইয়াও যে, গুণ চট পরিয়া একাকিনী বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইল,—জ্ঞাতিবন্ধু কেহ আসিয়া নিবারণ করিলনা, তাহার মাতা রম্ভাবতী কন্যার দুরবস্থার সংবাদ পাইয়াও তত্ত্ব লইলনা!—ইহা বড় বিসদৃশ কার্য্য হইয়াছে। যখন্ খুল্লনার বয়স্ ১২।১৩ বৎসর বৈ নহে, যখন্ সে কখনও পতিসহবাস করেনাই, যখন্ তাহার রজোযোগপর্য্যন্ত হয়নাই, তখনও তাহার বিদেশাগতপতির শয়নগৃহে যাইবার জন্য দিবাভাগহইতে অত ব্যগ্রতাপ্রকাশকরা—যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জতাসহকারে অত বাগ্বিতণ্ডা করা, নিদ্রিতপতিকে মৃতবোধ করিয়া আজুলীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে বসা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতির সহিত পাশক্রীড়া করিতে চাহা—এ সকলগুলাই যেন কেমন কেমন লাগে। তদ্ভিন্ন দ্বাদশবর্ষমাত্রবয়স্ক শ্রীমন্তের সিংহলে গমন এবং তথায় বিবাহের পর শালী শালাজ প্রভৃতির সহিত সেই সেইরূপ কথাকাটাকাটি, তাদৃশ বালকের পক্ষে সঙ্গত হয়না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসাবির্ভাবক ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। তদ্ভিন্ন কবির স্বদেশপ্রচলিত ভূরিভূরি এত অপভ্রংশশব্দের ব্যবহার আছে, যাহাদের অর্থ—এবং যাহাদের সংযোগ থাকাতে, সেই সেই বাক্যের

অর্থ—সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাযায়না, সুতরাং তত্তৎ-স্থলে রসভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমরা খুব রাঢ় অঞ্চলের লোক-দিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাকুড়ি, পাইকালা, কলন্তর, বুহি-তাল, ইত্যাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ বাহির করিতে পারিনাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এসকল দোষ—

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥"

ইত্যাদিন্যায়ে অবশ্যই উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনাকরি-য়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু শিশু-বোধকের গঙ্গাবন্দনায় কবিকঙ্কণের ভণিতি আছে; উহা চণ্ডীকাব্যস্থ গঙ্গাবর্ণন হইতে বিভিন্নরূপ। কবিকঙ্কণ ঐ প্রবন্ধটী পৃথক্ লিখিয়াছিলেন? কি উহা অন্যকোন গ্রন্থের অভ্যন্তরে ছিল, তাহা নিরূপিত হইবার যো নাই। যাহা-হউক, আমরা এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ চণ্ডীকাব্যের কয়েকটীঅংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন।

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়ে বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথাহে বণিক্‌রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেইহেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতকপাড়া, কালি দিবে মাংসের উধার॥—আজি কালকেতু যাহ ঘর।—কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু

আনিহ বদর॥ শুন গো শুন গো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী। আমার জোহার খুড়া, কালি দেহ বাকী কড়ী, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।—সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেবন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতূহলী, কান্দেতে কড়ীর থলী, হড়পী তরাজু করি হাতে॥—করে বীর বেণেরে জোহার।—বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া! উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥—খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।—হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়্যে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান॥

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দু ধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥ হাত বদল করিতে বেণের গেল মনে। পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥

ফুল্লরার বারমাস বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥ ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥ বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥ পদ পোড়ে খরতর রবির

কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥ বৈশাখ হইল বিষ—বৈশাখ হইল বিষ। মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥

সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবিকরে করে সর্ব্বশরীর দাহন॥ পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥ পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস—পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥

আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নবমেঘজল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥ মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে২। কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥ বড় অভাগ্য মনে গণি—বড় অভাগ্য মনে গণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি॥ মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি গাত্রে স্নান বৃষ্টিনীরে॥ দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান॥

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥ কত নিবেদিব দুখ—কত নিবেদিব দুখ। দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥ উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥

কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥ নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥ দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥ উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥ অভাগ্য মনে গণি—অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥

পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন॥ করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগী ফুল্লরা মাত্র

শীতের ভাজন ॥ হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥ বৃথা বনিতা জনম—বৃথা বনিতাজনম। ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥

নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজ্‌বাটী। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী ॥ ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥ নিদারুণ মাঘমাস—নিদারুণ মাঘমাস। সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস ॥

সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে। পীড়িত তপস্বিগণ বসন্ত-বাতাসে ॥ শুন মোর বাণী রামা—শুন মোর বাণী। কোন সুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী ॥ ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা। ক্ষুদসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥ কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল। মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল। দুঃখে কর অবধান —দুঃখে কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দমন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ বনিতা পুরুষ দোহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে ॥ দারুণ দৈবদোষে—দারুণ দৈবদোষে। একত্র শয়নে স্বামী যেন ষোল কোশে ॥

সিংহলে কোটালের নিকট শ্রীমন্তের স্তুতি।

কাঁকালে নাএর দড়া পিঠে মারে ঢেকা। দিবস দুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা ॥ সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে। খানিক সদয় হও বিষম বিপদে ॥ শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন। ঘুষ দিয়া কোটালের তুষিলেক মন ॥ ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরসবদন। শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন ॥ স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি। হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈল নিশাপতি ॥ সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা। স্নান করি করে গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা ॥ যব তিল কুশ মিল করেতে তুলসী। তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেবঋষি ॥ তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী ॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননি। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই ॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী ॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে

আমি আর যাবনা।। উর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশী-র্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাতা।। সবাকারে সমর্পণ করিনু জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী।।

প্রহেলিকা।

বিধাতানির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে রহে নিরাহার। যখন পুরুষ সেই হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।। ১।। ডিম্ব।

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়।। পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে। মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।। ২।। পক্ষী।

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব তার অতি সে বি-পুল। পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। বনেতে থাকিয়া করে বনের হংসন।। ৩।। পানা।

মনসার ভাসান।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই বোধহয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস দুই জনে মিলিত হইয়া মন-সার ভাসান রচনা করেন। ইহাঁরা দুইজনেই কায়স্থকুলো-দ্ভব ছিলেন, কিন্তু কোথায় ইহাঁদের নিবাস ছিল, বা কোন্ সময়ে ইহাঁরা গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। কিন্তু ইহাঁরা বেহুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া ত্রিবেণীপর্য্যন্ত পাঠাইবার সময়ে গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান জিলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য জিলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পা-রেন নাই। ইহাতে বোধহয় বর্দ্ধমানজিলার মধ্যস্থ কোন

গ্রামেই ইহাঁদের বাস ছিল। যাহাহউক ইহাঁদের দুইজনের কেহই গণনীয় কবি ছিলেননা। তবে ইহাঁদের গ্রন্থ পুরাতন ও বহুজনপ্রসিদ্ধ এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বনকরিয়া মনসার গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটীতে চামর-মন্দিরাসহযোগে তাহা গানকরিয়াথাকে, এই জন্যই ইহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত উপাখ্যান এই যে, চম্পাইনগর-নিবাসী চাঁদসওদাগরনামক এক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন, এইজন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্যদ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান, তথাপি মনসাদেবীকে গালিদিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে নখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনিনগরবাসী সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসাদেবীর কোপে বিবাহরাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতেপারিয়া চাঁদসওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুতকরিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা কলার মান্দাসের উপর সেই মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয়মাসে ত্রিবেণীপর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় নেত

ধোবানীর সাহায্যে সুরপুরে গমন করত নৃত্যদ্বারা দেবতা-দিগকে প্রীত করিয়া পতির জীবনলাভ করান। চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিতেন না, তাঁহাকে 'চেঙ্গমুড়ী কাণী' বলিয়া গালি দিতেন, হেঁতালের লাঠী লইয়া প্রহার করিতে যাইতেন, এই জন্যই তাঁহার উপর মনসার রাগ। এক্ষণে সওদাগর আর তাঁহার দ্বেষ করিবেননা—পূজাকরিবেন, বেহু-লার নিকটে এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া দেবী সওদাগরের পূর্ব্বনষ্ট ছয় পুত্রকেও বাঁচাইয়া দিয়া জলমগ্ন সমস্ত ধ-নও বহিত্রসমেত উদ্ধার করিয়া দেন। বেহুলা, বহিত্রসমেত সেই সমগ্র ধনসম্পত্তি, পুনর্জীবিত পতি ও ভাসুরদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করিলে মনসাদেবীর পূজাপ্রচার হয়।

এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি? তাহা বলিতে পারাযায়না, কিন্তু দেখিতেপাওয়াযায় যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে "নেত ধোবানীর পুকুর" নামে একটী প্রাচীনপুষ্করিণী আছে—পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যপুর হাসন্-হাটী নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্নদিয়া যে সা-মান্য নদীটী আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাইনগরনামক একটী গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদসওদাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটী উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর

বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্ পাক করিয়া খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিতে যাইলেই সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে। ফল কথা, ঐ স্থানে একজাতীয় সর্পও প্রচুরপরিমাণে আছে। তাহাদের চক্র নাই—বোধহয় বিষও নাই। উননের ভিতর, জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে, পাদুকার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দেখিতেপাওয়াযায়। তাহারা পার্য্যমাণে কাহাকেও দংশন করে না,—করিলে দষ্টব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধনকরিয়া সমীপস্থ মনসার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই সে আরোগ্যলাভ করে—নচেৎ মরিয়াযায়, ইহাই তত্রত্য লোকের বিশ্বাস।

বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া বোধহয়না। রোধহয় প্রাচীনপরম্পরাগত কোন মূল ছিল, কবিরা তাহাই অবলম্বনকরিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি, সহৃদয়তা ও বহুজ্ঞতার অভাবে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতেপারেন নাই। বাণিজ্যার্থবহির্গত চাঁদসওদাগরের নৌকাতে ঝড় বৃষ্টি, বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ, নখিন্দরবেহুলার বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা বাসরগৃহ নির্ম্মাণ, কলার মান্দাসে বেহুলার ভাসিয়া যাইবার সময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নামোল্লেখ, বেহুলার

সুরপুরে নৃত্য ও জলমগ্ন ডিঙ্গার পুনরুদ্ধারপ্রভৃতি বর্ণনসকল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিলে এই গ্রন্থকে চণ্ডীর অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই বোধহয়না। কিন্তু চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রাসময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রামনগরাদির বর্ণনা যেরূপ মনোহর ও অনেক দূরপর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে—বিচার্য্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনা সেরূপ কিছুই হয়নাই—বিশেষতঃ গ্রামনগরাদির স্থানসন্নিবেশগুলি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বোধহয়। যাহাহউক চণ্ডীতে ধনপতি লক্ষপতি সাধুদত্ত শঙ্খদত্ত চাঁদসওদাগর প্রভৃতি যে সকল গন্ধবণিকের বিবরণ ও নামোল্লেখ আছে, মনসার ভাসানেও তাহাদেরই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা কতক অনুমানকরা যাইতেপারে যে, চণ্ডীরচনার বড় অধিক পরে মনসার ভাসান রচিত হয়নাই।

এই উপাখ্যানবর্ণন সর্ব্বাঙ্গসঙ্গত ও সহৃদয়তার প্রকাশক না হউক, কিন্তু ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতির নিমিত্ত সতীর দুঃখভোগবর্ণনের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতেগেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধহয়, এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

মনসারভাসানের ভাষা তত সুললিত বা সুশ্রব্য নহে।

ইহাতে পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং গজগতি এই কয়েকটীমাত্র ছন্দ আছে। ছন্দেরও বর্ণবৈষম্য যতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনেকস্থলেই লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে রচনা বিলক্ষণ মধুরও বোধহয়। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ গ্রন্থ রচয়িতা দুই কবির দুইটী রচনা উদ্ধৃত হইল।

চাঁদসওদাগরের নৌকায় ঝড় বৃষ্টি।

দেবীর আজ্ঞায়, হনূমান ধায়, শীঘ্র লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ॥
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ডুবাতে সাধুর তরি।
বীর হনূমান্, অতি বেগবান, করিবারে ঝড় বারি॥
অবনী আকাশে, প্রখরবাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর, নায়ের নফর, নাহিক দেখে নিস্তার॥
গজ শুণ্ডাকার, পড়ে জলধার, ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর, বলে সওদাগর, যাইতে নারিনু রাজ্যে॥
হুড় হুড় হুড়, পড়িছে চিকুর, বেগে যেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার, ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
দেখিতে অদ্ভুত, হইছে বিদ্যুৎ, ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে বেণিয়া, কেন বা বাণিজ্যে আইনু॥
তরী সাতখান, চাপি হনূমান, চক্রবৎ দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর, আইল বিস্তর, তরীর আশে পাশে ভাসে।
চলে ডিঙ্গা লয়ে, রাখে পাক দিয়ে, অহিধায় গিলিবার আশে॥
ডিঙ্গার নফর, গ্রাসিল হাঙ্গর, কাছি গিলিল মাছে।
চাপিয়া তরণী, হনূমান আপনি, হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ডুবাইয়া নায়, চান্দ জল খায়, জগাতীর খলখল হাস।
জয় জয় মনসা, মা তুমি ভরসা, রচিল কেতকা দাস॥

পতিশোকে বেহুলার রোদন।

কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥

কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে॥
কনক চাঁদের দুর্গতি। মলিন হইল ভাতি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে করে বা কি। বেহুলা বেণ্যের ঝি॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশী। মুখ যার পূর্ণ শশী॥
খাইনু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥
বদনে বদন দিয়া। নয়নে নয়ন দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণ মূলে। মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার গুণমণি। তোমা বিনা কিবা জানি॥
কাতর হইয়া রামা। কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্দে॥
আমি হইনু পতিদণ্ডী। বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবি॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত।

পূর্ব্ববর্ণিত কবিদিগের কয়েকখানি গ্রন্থ রচনার পরই বোধহয় কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালামহাভারত রচনাকরেন। কাশীরাম "দেব" উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ-জাতীয় ছিলেন। নিজরচনার অনেকস্থানে তিনি এই উ-পাধির উল্লেখ করিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরামদেবে॥ ইত্যাদি।

কিন্তু দ্বিজভক্ত প্রাচীন কায়স্থেরা আপনাদিগকে 'দাস'

বলিয়াই পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাসিতেন, তদনুসারে ইনিও আপনার নাম কাশীরামদাস বলিয়াই সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীরাম আদিপর্ব্ব ও স্বর্গপর্ব্বের শেষভাগে—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥ কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম। প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥ তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

এই কয়েকটী শ্লোকদ্বারা আপনার যৎকিঞ্চিৎ যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনবৃত্ত জানিবার বড় অধিক উপায় নাই। ঐ শ্লোকদ্বারা স্থির হইতেছে যে, বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণীনামে এক পরগণা আছে (কাটোয়া নগর ঐ পরগণার অন্তর্গত)। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গিনামক প্রসিদ্ধগ্রাম কাশীরামের বাসস্থান ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত ছিল। কমলাকান্তের কৃষ্ণদাসাদি চারি পুত্র, তন্মধ্যে কাশীরাম তৃতীয় ছিলেন।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইন্দ্রাণীনামক স্থানে কাশীরামের বাসস্থান ছিল। ইহার প্রামাণ্যার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও যে, ইন্দ্রাণীর কথা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"মণ্ডনহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন। সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্ল্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন॥ (১)

"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপানি" ॥ (২)
"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী" ॥ (৩)

ইহার প্রথম শ্লোকে 'মণ্ডনহাট' নামক স্থানের যে উল্লেখ আছে,—মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শব্দ "মণ্ডলঘাট" করিয়া ফেলিয়াছে। মণ্ডলঘাট হুগলীজেলার মধ্যে, সুতরাং তৎসন্নিহিত ইন্দ্রাণী অবশ্যই হুগলীজেলার মধ্যগত হইবে—এই বোধেই কয়েকমহাশয়, কাশীরামের বাটী হুগলীজেলায় ছিল, ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—যে হেতু কবিকঙ্কণের লিখিত চণ্ডীর পাঠ 'মণ্ডলঘাট' নহে 'মণ্ডনহাট' ঐ মণ্ডনহাট ইন্দ্রাণীপরগণার মধ্যেই কাটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দেখিতে পাওয়াযায়। ঐ স্থানের সন্নিধানে ঘোষহাট, একাইহাট, বিকিহাট, পেংনীহাট, ডাঁইহাট প্রভৃতি হাটশব্দান্ত ১৩টী গ্রাম আছে। অতএব কবিকঙ্কণের কয়েকস্থানে উল্লিখিত 'ইন্দ্রাণী' বর্দ্ধমানজেলাস্থ ঐ ইন্দ্রাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে সংশয় নাই। কাশীরাম পরিচয়দানস্থলে "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ" বলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী গ্রাম বলেন নাই; সুতরাং তদ্দ্বারা ইন্দ্রাণীপরগণাই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন ঐস্থানে বারদুয়ারির ঘাট, গণেশমহাতার ঘাট, 'পীরের ঘাট প্রভৃতি গঙ্গার ধারে ধারে বারটী বাঁধাঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বরনামক শিবস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে একটী কথাও আছে যথা—

তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী, তিন শ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥

কবি এই বারঘাটকেই লক্ষ্যকরিয়া যে, "দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই কথা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রিতপুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রামবিষয়েও লোকের ভ্রম জন্মিয়াগিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে 'সিদ্ধি' গ্রাম লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি নাই—সিঙ্গিগ্রাম আছে, এবং ঐ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকেন, ঐ সিঙ্গি গ্রামের দক্ষিণাংশে কাশী-রামের বাসভবন ছিল—এক্ষণে সেই ভিটায় এক গন্ধবণিক্ বাস করে। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে 'কেশে পুকুর' নামে একটী প্রা-চীনপুষ্করিণী আছে, তাহাও কাশীরামের খনিত বলিয়া প্রা-চীনপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জেলা বৰ্দ্ধমানের ইন্দ্রাণীপরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের নিবাস ছিল। কাশীরামসংক্রান্ত কয়েকটী অলৌকিক উপাখ্যান তত্রত্য প্রাচীনলোকে অ-দ্যাপি বলিয়াথাকেন, বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর লিখিতহইল না।

একটী প্রবাদ আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর। ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর॥

"কাশীরামের পুত্র পৌত্র ছিলনা, একমাত্র কন্যা। মহা-

ভারতের আদি সভা বন ও বিরাটপর্ব্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই কাশীরামের মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপনের নিমিত্ত ঐ কন্যার স্বামী নিজ-জামাতার উপর ভারদিয়াযান। জামাতাও শ্বশুরের আদেশানুসারে সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্তু স্বকীয় কবিকীর্ত্তিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্বশুরের নামসমেতই ভণিতি দিয়া যান। সুতরাং সমগ্র মহাভারতই কাশীরামদাসবিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হয়" I—কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মূল নাই—রচনা-গতও এরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না—যদ্দ্বারা ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাসকরাযাইতেপারে। বিশেষতঃ সিঙ্গির নিকটবর্ত্তী চাঁড়ুলীনামকগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথমিত্র-মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন, তিনি সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, "কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই জন্যই তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ 'ইহা রচি কাশী-রাম যান স্বর্গপুর' এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে।" যাহাই হউক, আমরা কাশীরামদাসের কবিকীর্ত্তির অংশ অপরকে দিতে সম্মত নহি।

কাশীরামদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ বা কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয়করিবার উপায় নাই। তিনি গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা লেখেন নাই। তবে একমাত্র রচনাদর্শন করিয়া সময়ের অনুমান করিতে হইবে—তাহা করিয়া দেখাযাই-তেছে যে, কাশীরামদাসের রচনা কীর্ত্তিবাস ও মুকুন্দরামের রচনা অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক হইবে। কারণ উক্ত কবিদ্বয়ের রচনায় অপ্রচলিত প্রাচীনশব্দের ব্যবহার, ভা-ষার অসুকুমারতা ও ছন্দোবিষয়ে বর্ণগত বৈষম্য যত দে-খিতে পাওয়াযায়, কাশীরামের রচনায় তত দেখিতে পাওয়া যায়না। তদ্ভিন্ন রামায়ণ ও চণ্ডীর হস্তলিখিত ও মুদ্রিতপুস্ত-কের পাঠসকল যেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন, মহাভারতের উক্তবিধ পুস্তকদ্বয়ের পাঠ সেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ করিবার এককারণ বটে—যেহেতু অত্যন্ত প্রাচীনপুস্তকে যত পাঠান্তর হইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তত পাঠান্তর হয়না। যাহাহউক, পূর্ব্বে আমরা একপ্রকার সপ্রমাণ করি-য়াছি যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত; কাশীরামদাসের মহাভারত উহা অপেক্ষা আধুনিক হইলে অবশ্যই উক্ত সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত, বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তী সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি?—

আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে একখানি সভাপর্ব্বের পুস্তক সন ১১৪১ সালে অর্থাৎ ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অঃ] লিখিত। আরও একখানি উদ্যোগপর্ব্ব আমাদের নিকট আছে ; সেখানিতে সন তারিখ লেখা নাই, কিন্তু সেখানির অবস্থা দর্শন করিলে তাহা পূর্ব্বোক্ত সভাপর্ব্বের পুস্তক অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, বলিয়া অনুমান হয়। যদি তাহা হয়, তবে ঐ পুস্তক বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনপুস্তক স্বল্পকালমধ্যে দেশব্যাপী হইতে পারেনা। আমরা যে পুস্তকের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা যে স্থানে লিখিত, সে স্থান কাশী-রামের বাসগ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সুতরাং অন্ততঃ ৩০ বৎসরের ন্যূনে কাশীরামের রচনার ততদূর পৌঁছান সম্ভববোধ হয়না। অতএব আমাদের বোধহয় সন ১০৭৫ সালে বা ১৫৯০ শকে অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত লেখা সমাপ্ত হইলেপর আমরা উক্ত সিঙ্গি-গ্রামবাসী ওকড়সা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপ্রদাসতর্করত্ন মহাশয়ের এক পত্র পাইলাম। তিনি এবিষয়ের অনেক অনুসন্ধান করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে " কাশীরামদাসের পুত্র * আপন পুরোহিতদিগকে যে

* পুত্রের নাম জানিতে পারাযায় নাই।

বাস্তুবাটী দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত; এক্ষণে ২।৩ খানি ছিন্ন বস্ত্র দিয়া আঁটা আছে, তথাপি অনেক স্থান ছিন্ন ও গলিত হইয়া গিয়াছে—সকল কথা পড়িতে পারাযায়না” ইত্যাদি—যদি এদানপত্র প্রকৃত হয়, তবে কাশীরাম এক্ষণ হইতে ২০০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কাশীরামদাস অতিবিনীত কবিত্বগর্ব্বশূন্য পরমভাগবত লোক ছিলেন। মহাভারতের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে—অথবা পূর্ব্বেই কেন, এপর্য্যন্ত কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াও আপনাকে ‘কবি’ ও আপনার ‘রচনা মধুর’ এরূপ কোথাও কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কেবল ব্যাসদেবের ও মহাভারতকথার ভূরি ভূরি প্রশংসাতেই তাঁহার সকল ভণিতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

“ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত। কাশীরামদাস কহে পাঁচালির মত ॥” ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরামদাস ॥ “মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥”

ইত্যাদি যে কোন ভণিতিই পাঠ করাযাউক, তদ্দ্বারাই তাঁহার বিনয়নম্রতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। তিনি সংস্কৃত জানিতেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। কারণ তাঁহার মহাভারত মূলসংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেক

স্থানেই তিনি ভূরি ভূরি বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতনরূপ যোজনা করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। মূল ও ভাষা মহাভারতের যে কোন স্থান খুলিয়া পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলেই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একেবারে নূতনসঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান নামে যে একটী বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল সংস্কৃতে একেবারে নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন্ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও খুল্লনার পরীক্ষাদানাবসরে—

"কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তানারী"

এই কথার উট্টঙ্কন আছে, তখন্ আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ উপাখ্যান কোন পৌরাণিকমুল হইতেই হউক বা অন্যরূপেই হউক দেশমধ্যে প্রথিত ছিল; কবি তাহাকেই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধহয়, কৃত্তিবাসের ন্যায় কাশীরামদাসও কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। যে হেতু তিনি নিজেই কয়েক স্থলে লিখিয়াছেন—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার॥

যাহাহউক কাশীরামের সংস্কৃত জানা না থাকিলেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধহয়না। ঐ রচনাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দ সকল প্রযুক্ত আছে যে, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সহজকথা নহে।

কবিত্ব বিষয়ে কাশীরামদাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তি কম ছিল, একথা বলাযায়না। মহাভারতে আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও শান্ত রসের ভূরি ভূরি স্থল আছে, কাশীরাম সেই সকল স্থলেই কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ পরিচয় মহাভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটীমাত্র আমরা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম——

দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা, দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দোঁহে গেল বন।
চারু ভুরূলতা, দেখিয়া মন্মথা, নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দুর চাঁচর চুলে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব, হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ, নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝনঝন, চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু, চারুযুগ উরু, দেখি নিন্দে হাত হাতি।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ, নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল, কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ॥

কমলবদন, কমল নয়ন, কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্ঘ্রি তল, ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়, অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত, কোমল মধুপ বৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে, সৃজিল কমলজাত।
কমলাবিলাসী, বন্দি কহে কাশী, কমলাকান্তের সুত॥
আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদোদ্যত ব্রাহ্মণরূপী অর্জ্জুনকে দেখিয়া সভাসদদিগের উক্তি।

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন। সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥ দেখি দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥ অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা। নখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥ সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল। খগরাজ, করে লাজ, নাসিকা অতুল॥ দেখ চারু, যুগ্মভুরু, ললাটে প্রসর। কি সানন্দ, গতিমন্দ, মত্ত করিবর॥ ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগবর, জানু সুবলিত॥ বুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখিএরে, ধৈর্য্যধরে, কোথা কে কামিনী॥ মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিল নাগে॥ এইক্ষণে, লয় মনে, বিন্ধিবেক লক্ষ্য। কাশী ভণে, কৃষ্ণজনে, কি কর্ম্ম অশক্য॥ আদিপর্ব্ব।

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ।

আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে। চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥ কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥ শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গর। ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর॥ পর্ব্বতআকার হস্তী ভীষণদর্শন। চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদগর্জ্জন॥ দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন। দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেই ক্ষণ॥ না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস। শরজাল করিয়া পূরিল দিক্পাশ॥ বরিষা-কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে। দিনকর তেজ যেন সর্ব্বঠাঁই লাগে॥ যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয়গণ। করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥

বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ। বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥ ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে। ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে॥ ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির। রথবেগে পড়িল অনেক মহাবীর॥ মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে॥ কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। খণ্ড২ হইয়া পড়িল চতুর্ভিত॥ ধনুকসহিত বামহাতে ফেলে কাটি॥ বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটী॥ অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট ফটী। কাটিয়া ফেলিল কার দন্ত দুই পাটী॥ শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া পড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥ কাটিলেন রথধ্বজ করি খণ্ড২। মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥ তীক্ষ্ণ-বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্ত্তনাদ করি পড়ে মস্থি বহুদল॥ চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয়া পড়ে দন্ত। পেটেতে বাজিল কার বাহি-রায় অন্ত্র॥ এই মত মাহামার করিল ফাল্গুনি। সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনী। বিরাটপর্ব্ব।

রণভূমিতে দুর্য্যোধনকে পতিত দেখিয়া গান্ধারীর বিলাপ।

পুত্রদরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল। গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥ পঞ্চপাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥ সম্বিৎ পাইয়া তবে গান্ধারতনয়া। চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥ দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যো-ধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥ শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার। কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥ কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়। একলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥ কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ। কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥ একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়। হেন দুর্য্যো-ধন রাজা ধূলায় লোটায়॥ সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥ জাতি যূথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর। রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥ এসকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া। হেন তনু লোটে ধূলা দেখনা চাহিয়া॥ অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তূরী। লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥ শোণিতে সে আজি তনু হইল শোভন। আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥ ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুদ্ধহেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর॥

উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥ কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥ এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা। প্রিয়-ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥ নারীপর্ব্ব।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে প্রকার নূতন২ ছন্দের অনুসরণ আছে, মহাভারতে তাহা অধিক নাই। ইহাতে আদ্যোপান্ত সমুদায়ই পয়ার; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী ও ২।১টী তরল পয়ার প্রভৃতি আছে। ইহাতে বোধহয় কবি, সাগরস্বরূপ ভারত-রচনায় প্রবৃত্তহইয়া কিরূপে প্রারব্ধের পরিসমাপন করিবেন, তজ্জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন, এবং রচনার শীঘ্রতাসম্পাদন নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, সুতরাং ছন্দের পারিপাট্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতে পারেননাই। এই জন্যই মহাভারতে নূতন ছন্দের তাদৃশ অনুসরণ হয়নাই। কিন্তু এস্থলে ইহা স্বীকারকরিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থ সকলে যেমত যে সে বর্ণ লইয়া অন্ত্যবর্ণের মিলকরিয়া দেওয়াহইয়াছে, ইহাতে সেরূপ করাহয়নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধনিয়ম ইহাতে অনেকদূর অনুসৃতহইয়াছে।

যাহাহউক, কীর্ত্তিবাস রামায়ণকে ও কাশীরামদাস মহাভারতকে ভাষায় পরিবর্ত্তিতকরিয়া সাধারণ লোকের যে, কিরূপ উপকার করিয়াগিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষকরাযায় না। অধিক কি বাঙ্গালাদেশমধ্যে ইহাঁরাই বাল্মীকি ও ব্যাসকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, বলিতে হইবে। ঐ দুই গ্রন্থ ভাষায় না থাকিয়া কেবল সংস্কৃতে বদ্ধ থাকিলে, রাম-

চন্দ্রের অকপট পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের অবিচলিত জ্যেষ্ঠানুরাগ, সীতার অনুপম পাতিব্রত্য, পাণ্ডবদিগের অলৌকিক সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা, পঞ্চপতিত্বেও পাঞ্চালীর আশ্চর্য্যরূপ সতীধর্ম্মরক্ষা, ধার্ম্মিকদিগের বিপদ্বিনাশার্থ কৃষ্ণরূপী ভগবানের তাদৃশ চতুরতা, এ সকল কথা দেশের কয়জন লোকের মুখে শুনাযাইত? এখন্—বিশেষতঃ আবার ছাপার পুঁথি হওয়াতে—মুদীরাপর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া কথায় কথায় দৃষ্টান্তদিয়া থাকে। ইহা মহাত্মা কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের অনুগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পশ্চিমদেশে তুলসীদাসের রামায়ণ থাকাতে তদ্বর্ণিত উপাখ্যান সাধারণে বলিতেপারে বটে, কিন্তু ভারতের সেরূপ কোন ভাষাগ্রন্থ না থাকায় তদুপাখ্যানসকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যাহাহউক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, অথবা কাশীদাসের পরম শ্লাঘার বিষয়, বলিতেহইবে যে, মহাসমৃদ্ধ মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বহুল ধনব্যয়ে ১০। ১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া অবিশ্রান্ত ৮ বৎসরকাল পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক যে মহাভারতের বাঙ্গালাগদ্যানুবাদ সমাপন করিতে পারিয়াছেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বর্দ্ধমানাধিপ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্রবাহাদুর ঐরূপে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য লইয়া ১৭৮৪ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াও, অদ্যাপি

যে মহাভারতের বাঙ্গালাঅনুবাদ শেষকরিতে পারিলেন না! নিস্ব কাশীরামদাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিঁড়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দোবন্ধে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াগিয়াছেন! তাদৃশ বৃহৎকার্য্যসম্পাদনে বোধহয় কেবল কথকের মুখে কথাশ্রবণই তাঁহার প্রধান সাহায্য হইয়াছিল।

যাহাহউক এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, কথকদিগের হইতেও বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃতশব্দসকল চলিতভাষায় যোগকরিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা গীতস্বরসহকৃত হওয়ায় সাধারণের মনে অঙ্কিতহইয়াযায়, সুতরাং সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃতহইয়া ভাষার পুষ্টিসম্পাদন করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থাকিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত বোধহয় আমরা কখনই প্রাপ্তহইতামনা। কথকতার ব্যবসায়ও আমাদের দেশে নূতন নহে—কবিকঙ্কণের পূর্ব্বেও উহার প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্ব্বকালীন লোকেরা কথকদিগের বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন। গৌরবের কারণও ছিল; যেহেতু তৎকালে কথকদিগের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণহরি, গদাধরশিরোমণি, রামধনতর্কবাগীশ প্রভৃতি কথকদিগের নাম লোকে অদ্যাপি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিয়াথাকে। সম্প্রতি

কতকগুলি নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনেকেরই পানাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তিদর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই লোকের অভক্তি জন্মিয়াগিয়াছে। এখন্ আর কোন ভদ্রলোকে নিজবাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্য্যমাণে সম্মত হননা।

মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও স্পষ্ট; ইহাতে বোধহয় ঐ সময়ে বাঙ্গালার অনুশীলন কিছু অধিক হইতে আরম্ভহইয়াছিল। পূর্ব্বহইতে গণনাকরিয়াও দেখাযাইতেছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাপুস্তকের সঙ্খ্যা অনেকগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ চণ্ডী ও রামায়ণের সময় অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ শ্রীসৌষ্ঠব হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

কাশীরামদাস মহাভারত ভিন্ন আর কোন রচনাকরিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায়না। যদি করিয়াও থাকেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছে বোধহয়।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন।

কাশীরামদাসের মহাভারতের পর প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্তের মধ্যে বাঙ্গালার কোন ভাল গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ঐ কালমধ্যে কোন ভালগ্রন্থ হইয়াছিল? কি হয় নাই? তাহাও স্থির বলিতে পারাযায়না। যাহাহউক আমরা মহাভারতের পর একেবারে শিবসঙ্কীর্ত্তনে হস্তক্ষেপ

করিলাম। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ইহার প্রণেতা। ইনি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের পূর্ব্বাধিকারী যশমন্তসিংহের সভাসদ ছিলেন এবং সেই সভাতেই ঐ সঙ্গীতের প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রামাক্ষয়বাবু এবিষয়েও অনেকগুলি সংবাদ দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে—বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল। পরে তিনি যশোমন্তসিংহের সভাসদ হইয়া মেদিনীপুর পরগণার অন্তঃপাতী অযোধ্যাবাড়গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যেই উক্ত রাজপরিবারের ও নিজপরিবারের যে সকল বিস্তৃতবিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াদিলেই এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবেনা। সে সকল বিষয় এই—

"মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথ সমধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে, রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশমন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥"
"তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥"
"ভট্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎসিংহ পরকাশ, রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণপটে, রচাইল মধুরসঙ্গীত॥"
"যশমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস। সে রাজসভায় হলো সঙ্গীত প্রকাশ॥ জগতে ভরিল যার যশকীর্ত্তি গানে। কর্ণপুরে কলিরামে

কেবা নাই জানে ॥ ভঞ্জভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত”—“ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতী ত্রয়। দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনেয় ছয় ॥ ভাগিনেয়ীপুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যোঘাটী। এসকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জটি ॥ সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়। পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিও ॥”

এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলেই কবি আপনাকে রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত ও যশবন্তসিংহের সভাসদ বলিয়া ব্যক্তকরিয়াছেন। যাহাহউক কবির ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীপুত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোন স্থলে সন্তানের নামোল্লেখ নাই, অতএব বোধহইতেছে, তাঁহার সন্তান হয়নাই। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী দুই স্ত্রীর নামোল্লেখ থাকায় ইহাও অনুমানহয় যে, একের বন্ধ্যাত্ববোধ হইলে অপরবিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু রামাক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন যে, কবির বংশে অযোধ্যাবাড়গ্রামে অদ্যাপি দুইটী নাবালক আছে, কিন্তু সে দুইটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ ? তাহা জানিতেপারাযায়নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণগড় মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী। তথায় যশবন্তসিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্তু ভগবতী মহামায়ার ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী (যোগাসনবিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রামেশ্বরকবি জপ করিতেন, তাহাতে মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এবং সেই বরপ্রভাবেই তিনি শিবশঙ্কীর্ত্তন রচনাকরেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

শিবসঙ্কীর্ত্তনকে ঐ দেশে 'শিবায়ন' কহে। কবি কোন্ শকে এই শিবায়ন রচনাকরিয়াছিলেন, নিজরচনামধ্যেই তাহা উল্লিখিত আছে যথা—

"শাকে হলে চন্দ্রকলা রাম করতলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥ সেই কালে শিবের সঙ্গীত হলো সারা।"—

আমরা অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়াও এই শ্লোকহইতে স্পষ্টরূপে কোন শাক বাহির করিতেপারিলামনা। বোধ হয় উক্তরচনায় লিপিকরপ্রমাদবশতঃ পাঠব্যতিক্রম হইয়াগিয়াথাকিবে। মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শাকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ নিবেশিত আছে। উহা অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গতকরা যাইতে পারে। যাহাহউক অগত্যা উহাই স্বীকারকরিতে হইল। কিন্তু এবিষয়ে আর একটী প্রমাণ পাওয়াযাইতেছে—নবাব সূজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অব্দে] এই যশবন্তসিংহ ঢাকার নায়েব নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইহাঁরই যত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব সায়স্তাখাঁর সময়হইতে আবদ্ধ ঢাকানগরের পশ্চিমদ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহাহউক ইনি ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিতপুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বেও ঐ গ্রন্থ রচিতহওয়া অসম্ভাবিত

নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখাযাইতেছে যে, দেও-য়ানীলাভের পূর্ব্বেও যশবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শীদকুলীখাঁর অধীনে বহু-দিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ফ-লতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের বিদ্যা-সুন্দরের পূর্ব্বে যে রচিতহইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিকঙ্কণ—দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থসূচনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, কন্দল প্রভৃতি-ক্রমে—যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভকরিয়াছিলেন, ইনিও অবিকল সেইরূপে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে ইহাতে ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীব্রত, রামনামমা-হাত্ম্য, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সতীমাহাত্ম্য ও ব্রতাদির অনেককথা বর্ণিত আছে। ঐ সকল কথার পর শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁ-হাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গ-মন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারীবেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বাগ্দিনীরূপে প্রতারণাকরার প্রত্যুত্তরদান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিতহইয়াছে, তাহা আমরা অন্যকোথাও দেখি নাই—বোধহয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে। এই সকল স্থলে কবি বিলক্ষণ চতুরতা, বিলক্ষণ পরিহাসরসি-কতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখাপরাইবার বৃত্তান্তটা আমাদের এতই মিষ্ট

লাগিল যে, ২। ৩ বার পাঠকরিয়াও তৃপ্তিবোধ হইলনা। কেবল ঐ স্থলই কেন? কার্ত্তিকগণেশের কন্দল, পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কন্দলপ্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ প্রীতিকর। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থখানি অবশ্যই উৎকৃষ্টকাব্যমধ্যে গণ্যহইতেপারে। তবে করুণরস না থাকিলে কোন কাব্যই মনকে তত আর্দ্র করিতেপারেনা—কবি এগ্রন্থের কোন স্থলেই করুণরসের তত উদ্দীপ্তি করিতে পারেননাই।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের নায়কনায়িকা দেবদেবী, সুতরাং তাঁহাদের আচারব্যবহারের যুক্তাযুক্ততাবিচার অকর্ত্তব্য। কবির রচনা বেশ কোমল ও বিশদ নহে। ইনি বড়ই অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—স্থানে স্থানে অনুপ্রাসসকল বেশ মিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে কতকগুলি বিলক্ষণ কর্কশও বোধহয়। নিম্নভাগে তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃতকরিয়া দেওয়াগেল, পাঠকগণ দেখিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন।

পিতাপুত্রের ভোজন।

যোগ করে দুটী পুত্র লয়ে তার পর। পাত্তিত পুরটপীঠে বসে পুরহর॥ তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥ তিন জনে একুনে বদন হলো বার। গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥ তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥ দেখে দেখে পদ্মাবতী বসে এক পাশে। বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥ শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্তদিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥ গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়ে খা॥ মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥ রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।

যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ? ।। হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে ।। লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝী। সূপ হলো সাঙ্গ আন আর আছে কি ? ।। দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ ।। সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ।। উলূণ চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন। এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন ।। চট্‌পট্‌ পিশিতমিশ্রিত করে যূষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে ।। চঞ্চল চরণে বাজে নূপুর চমৎকার। রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার ।। দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর ।। ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাজে ।। খরবাদ্যে সূপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে। সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ।। হরবধূ অন্নমধু দিতে আরবার। খসিল কাঁচলী হলো পয়োধর ভার ।। নাটাপাটা হাতে বাটা আলুইল কেশ। গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ ।। ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী। ক্ষুধারূপ অন্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি ।। উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার। অতঃপর গণ্ডূষ করিতে নারে আর ।। ছট্‌ করে হৈমবতী দিতে আইল ভাত্‌। শার্দ্দূল ঝাম্পনে সবে আগুলিল পাত ।।

হরপার্ব্বতীর কন্দল।

আত্মারাম আজি রামরসে হৈয়া ভোর। ভোলা ভুলে গেল ভিক্ষা দুঃখে নাহি ওর ।। ভাত নাই ভবনে ভবানীবাণী বাণ। চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান ।। কিঞ্চিৎ করিয়া কোপ কহিলেন ভব। কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব ? ।। বাড়া ব্যয় কর বুড়া বৈসে পাছে রয়। বৃদ্ধকালে ঘুরাইয়া বধিবে নিশ্চয় ।। দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি। ভিক্ষুকের ভার্য্যা হৈলে ভূপতির ঝী ।। দেবী বলে দেবদেব দোষ কেন দেও। দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখা করে নেও ।। বিশ্বনাথ বলে এই বয়েসে আমার। বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার ।। লেখা জোখা জানি নাহি রামরস পেয়ে। হয়েছি অজরামর হরিগুণ গেয়ে ।। মিছা লেখা জোখা একা মনে মনে কর। ঠেকিছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার ।। ভ্রূভঙ্গেতে, ভবানি ! ভুবন ভুলে যায়। ভোলানাথে ভুলাইবে কতবড় দায় ।। ক্ষমাকর ক্ষে-

মঙ্করি! খাবনাহি ভাত। যাবনাই ভিক্ষায় যাকরে জগন্নাথ॥ পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাবে। চাক্ করিলে ভাঙ্ এখন পাক করিতে কবে॥ এখন্ বাপের কাছে বসে আছে পো। ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করি! খেতে দেনা গো॥ বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা দায়॥

শঙ্খপরিধানের উপাখ্যান।

হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ। কান্ত সঙ্গে করিয়া কথার অনুবন্ধ॥ প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে। রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥ গদ্গদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ। পূর্ণকর পশুপতি পার্ব্বতীর সাদ॥ দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেও দুটী বাই। কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাই চাই॥ লজ্জায় লোকের কাছে লুকাইয়া রই। হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥ তুলডাঁটী পারা দুটী হস্ত দেখ মোর। শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥ পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে। তখন্ তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে॥ শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা। অভাগার ঘরে ইহা অসম্ভব কথা॥ গৃহস্থ গরীব যার সাতগেঁটে ট্যানা। সোহাগে মাগীর কানে কাঁটি কড়ি সোণা॥ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা। মিন্‌সে মরে জোন খেটে মাগী মাগে শাঁখা॥ তেমনই তোমার দেখি বিপরীত ধারা। রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা॥ অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান। স্বতন্তরা বট শঙ্খ পর নাই কেন॥ নিবারিতে নাহি কেহ নহ পরাধীন। ত্যক্ত কর কেন মিছা কহ সারাদিন॥ মহেশের মন জান মহতের বী। আপনি অন্তরযামী আমি কব কি॥ বুড়াবৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর। সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর॥ জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে॥ ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ। কেন অকিঞ্চন সঙ্গে কর বিসম্বাদ?॥ বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥ সেই খানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে। জানিয়া জনক ঘরে যাও এইক্ষণে॥ একথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে। শূন্য হলো সব যেন শেল মারে বুকে॥ দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী প্যায়। কান্ত সনে ক্রোধ করে কাত্যায়নী যায়॥ কোলে করি কার্ত্তিকেয় হস্তে গজানন।

চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলে দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥ যাও যাও যত ভাব জানাগেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায়॥ রামেশ্বর ভাষে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝী॥

হিমালয় হইতে হরপার্ব্বতীর প্রত্যাগমন।

ঘর যেতে হর চায়, গৌরী গিয়া কহে মায়, শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী, কাকুস্বরে করেন রোদন॥
সুখময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুগৃহে দুঃখগণ্যা, কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে আমি সারা, পরাণপুতুলী তারা, কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায়॥
পাইনু পরম সুখ, পাসরিছি সব দুখ, নিরখিয়া তুয়া মুখ চাঁদে।
তোমারে বিদায় দিয়া, কেমনে ধরিব হিয়া, মনের সহিত প্রাণ কাঁদে॥
বসাইয়া বরাসনে, পালিব পরাণ পণে, মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত দিন জীব, আর না পাঠাএ দিব, ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল॥
ননীর পুতলী ছিল, জ্বলন্ত অনলে দিল, বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী নারী, সকল খণ্ডাতে পারি, কপাল খণ্ডন নাহি যায়॥
গৌরীর গলায় ধরে, বিস্তর বিলাপ করে, জননী কাঁদিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদনখানি, বলিয়া মধুর বাণী, পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায়॥

অদ্যাপি অনেক ভিক্ষুকে যে, ডম্বুরুবাদনপূর্ব্বক ভগবতীর শঙ্খপরিধানের বৃত্তান্ত গান করিয়া ভিক্ষা করে, বোধহয়, এই শিবসঙ্কীর্ত্তনই সেই সকল গানের মূল। অনেক স্থলে অবিকল এই গ্রন্থের পদ্যই আবৃত্তি করিতে শোনাযায়। শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষা যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত-

জ্ঞান না থাকিলে ওরূপ শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থরচনা করা সম্ভব হইত না। তদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে কুমারসম্ভবাদি সংস্কৃতগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়—এবং অনেক প্রাচীন অধ্যাপকে কবিকঙ্কণের শ্লোকের ন্যায় শিবসঙ্কীর্ত্তনেরও অনেক শ্লোক আদরপূর্ব্বক আবৃত্তি করিয়াথাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ অপেক্ষা কাশীরামদাসের মহাভারতে ছন্দের বর্ণবৈষম্যাদি দোষ যেরূপ অল্পপরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ। ইহাতেও নূতনরূপ ছন্দের রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়াযায়না। পয়ার দীর্ঘত্রিপদী ও লঘুত্রিপদী ইহাই প্রায় সমুদয়—কেবল ২।১টী স্থলে একাবলী ও ভঙ্গত্রিপদী আছে। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে "পদ্মা কি করি উপায়" "হিমালয় হলো শোকাকুলি" ইত্যাদিরূপ ধুয়ার মতও লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মহাভারত অপেক্ষা শিবসঙ্কীর্ত্তনে ছন্দোবিষয়ে কিছু পারিপাট্য হয়নাই।

রামেশ্বরেরও শিবসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ আছে, বা ছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়াযায় নাই।

রামপ্রসাদসেনের বিদ্যাসুন্দরাদি।

শিসঙ্কীর্ত্তনের রচয়িতা রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদ সেন বোধহয় এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। তবে রামেশ্বর

প্রাচীন ও রামপ্রসাদ নব্য এইমাত্র। রামপ্রসাদের জীবন-বৃত্তসম্পৃক্ত কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্তেরই মূল কবিবরঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তপ্রকাশিত মাসিক প্রভাকর। প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তসঙ্কলনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তমহাশয়ই অশেষপরিশ্রম স্বীকারকরিয়াছিলেন। অতএব তিনিই এই কার্য্যের জন্য সাধুবাদের প্রথম পাত্র। যাহাহউক আমরা এস্থলে তাঁহার ও অপরাপর মহাশয়দিগের রচিত পুস্তকহইতেই রামপ্রসাদের জীবনসংক্রান্ত কয়েকটী সংবাদ সংগ্রহকরিলাম।

প্রসিদ্ধ হালীসহরের মধ্যবর্ত্তী কুমারহট্টনামক স্থান রামপ্রসাদের জন্মভূমি। তিনি বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বরসেন ও পিতার নাম রামরামসেন ছিল। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যেই নিজবংশের সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নভাগে তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাসতুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত, ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি! ময়ি কুরু দয়া॥"

"জ্যেষ্ঠাভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥ ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ন দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥ ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আত্মাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥ সর্ব্বাগ্রজ ভগ্না বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥ গুণনিধি নিধিরাম

বৈমাত্রের ভ্রাতা। তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥" জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥ শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥"

উপরি লিখিত উক্তিদ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতেছে যে, কবির রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং জগদীশ্বরী নামে এক কন্যা ছিলেন। বাসস্থানের কথাও তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্টগ্রাম" ইত্যাদি।

বোধহয় রামপ্রসাদসেন বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বনকরেননাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কলিকাতায় কোন ধনিকের* সংসারে মুহুরিগিরিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই পরমার্থ-চিন্তাতেই রত থাকিত, বিষয়কার্য্যে বড় ব্যাপৃত হইতনা। বাল্যাবধিই তাঁহার কবিত্বশক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছিল; ঐ শক্তি-সহকারে তিনি কালীবিষয়কগীতি রচনাকরিতেন। সেই সকল গীতি এবং কালীনাম আপনার নিকটস্থ হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই লিখিয়ারাখিতেন। একদিন উক্ত ধনিকের প্রধানকর্ম্মচারী তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রভুকে প্রদর্শনকরেন। প্রভু পরমশাক্ত

* কাহারও মতে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের, কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্রের।

ও গুণজ্ঞলোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের লেখা আদ্যোপান্ত পাঠকরিলেন এবং তন্মধ্যে এই গানটী—

আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নেমক্ হারাম নই শঙ্করি। পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি। ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥ শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি। অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি॥ আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণধূলার অধিকারী॥ যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি। যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি॥ প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি। ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন, রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থক সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইয়া কেবল উক্তরূপকার্য্যেই সময়াতিপাত করিতে উপদেশ দিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়াদিলেন।

তদনুসারে রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমার্থচিন্তা ও নানাবিধ গীতরচনা করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের গানের সুর নূতনরূপ, উহা যার পর নাই মধুর এবং সহজ—অর্থাৎ যাহাদের তাল মান কিছুই বোধনাই, তাহারাও অনায়াসে রামপ্রসাদের গান গাইতে পারে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সময়ে নিজাধিকার কুমারহট্টে মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ ও বিদ্যার উৎসাহদাতা লোক এদেশে কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি

রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গান শুনিয়া ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া পরমানন্দে থাকিতেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতবিদ্যা অধিক ছিলনা এবং স্বরও অত্যন্ত মধুর ছিল না—কিন্তু স্বরচিতপদের গানে তাঁহার এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি লোককে আর্দ্র করিয়া দিতেন। কথিত আছে রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শীদাবাদে আসিয়াছিলেন, এবং তথায় গঙ্গার উপর নৌকার মধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও নৌকাকরিয়া নিকটদিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিজনৌকায় আনাইলেন, এবং গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের নিকটে বসিয়া হিন্দীগান আরম্ভ করিলেন, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “ না না ওগান নয়—ওনৌকায় যে গান গাইতেছিলে, সেই গান গাও ” অনন্তর রামপ্রসাদ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্বরচিত গানসকল গাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে নবাবের পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়াগেল।

কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে ক্রমে ক্রমে অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি উহাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীতশ্রবণ

করিতেন এবং তাঁহাকে ও তত্রত্য আজুগোসাঁইকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বিবাদ লাগাইয়াদিয়া কৌতুক দেখিতেন। আজুগোসাঁইকে সকলে পাগল মনেকরিত। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে কিছু কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল। রামপ্রসাদ কোন গান রচনাকরিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটী উত্তর দিতেন। নিম্নভাগে রামপ্রসাদ ও আজুগোসাঁইএর দুইটী গানের কিয়দংশ লিখিতহইল। রামপ্রসাদের গান—

এই সংসার ধোঁকার টাটী। ওভাই আনন্দবাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি॥ ইত্যাদি।

আজুগোসাঁইএর উত্তর—

এই সংসার রসের কুটী। খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটী॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি এবং ‘কবিরঞ্জন’ এই উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ রাজদত্ত সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর নামে এক পদ্যগ্রন্থরচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের ‘কবিরঞ্জন’ নাম দিয়া রাজাকে অর্পণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে আর দুই খানি গ্রন্থও রচনাকরিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের একটী গানে “লাখ উকীল করেছি খাড়া” এই কথার উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচনা করি-

য়াছিলেন। তাহা সম্ভব না হউক, তিনি যে, বহুসংখ্যক গীতরচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। এই সকল গীত কুত্রাপি একত্র পাওয়াযায়না, 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' নামক পুস্তকেও কয়েকটী মাত্র আছে। অনেক ভিক্ষুকে রামপ্রসাদী পদ গানকরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিকমতাবলম্বী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গবোধে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিত—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা তত্রত্য প্রসিদ্ধঅধ্যাপক বলরাম-তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞাকরায় তিনি নিম্ন-লিখিত গানটীদ্বারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন যথা—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে॥"

এইরূপ সাংসারিক সকলবিষয়েই সামান্য সামান্য কথায় মুখে মুখে গানরচনাকরিবার শক্তি থাকায় রামপ্রসাদকে অনেকে কালীর বরপুত্র বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিশ্বাসকরিত। রামপ্রসাদেরও মনেমনে বোধছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মেও কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ জন্মে তিনি আপন স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনেকরিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী কালী স্বপ্নযোগে তাঁহার পত্নীকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন; বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অনেক স্থলে এই কথার উল্লেখ আছে, যথা

"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বি-

মুখ আমারে ॥ জন্মে২ বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব ॥”

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, নীলুপাটুনিনামক কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদ নামে একজন কবি ছিলেন। নিম্নলিখিত গীতাংশে তাহার উল্লেখ পাওয়াযায় যথা—

“যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেম্‌নি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন ॥”

কেহ২ অনুমানকরেন প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী পদসকল এই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচিত—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নহে। কিন্তু গীত ও বিদ্যাসুন্দরাদি গ্রন্থের ভাষাদির সৌসাদৃশ্য দর্শনকরিয়া অপরে এ কথায় কোনরূপে বিশ্বাস করেন না।

কবিরঞ্জনরামপ্রসাদের জীবনবৃত্তবিষয়ে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেকলোকে তাহাতে বিশ্বাস করেন, এই জন্য নিম্নভাগে কয়েকটী লিখিত হইল—একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন; তিনি বেড়ার যে পার্শ্বে বসিয়া দড়িতে গাঁইট দিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাহার অপরপার্শ্বে বসিয়া আবশ্যকমতে দড়ী ফিরাইয়াদিতেছিলেন; হঠাৎ কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ায় জগদীশ্বরী তথা হইতে চলিয়াযান—রামপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাননাই, কিন্তু দড়ী পূর্ব্ববৎ সময়মত ফিরিয়াআসিতেছিল; কিয়ৎক্ষণপরে কন্যা তথায় আসিয়া বেড়া অনেকদূর বাঁধাহইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ী ফিরাইয়া দিল? জিজ্ঞাসা-

করায় রামপ্রসাদ কহিলেন 'কেন মা! তুমিই ত বরাবর দড়ী ফিরাইয়াদিতেছ'! তখন্ কন্যা আপনার কার্য্যান্তরগমনের কথা প্রকাশ করিলে রামপ্রসাদের বোধ হইল যে, তবে সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী আসিয়া দড়ী ফিরাইয়া দিয়াগিয়াছেন।

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা কহিলেন রামপ্রসাদ! 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছে, পড়িয়া দেখ'; রামপ্রসাদ পড়িয়া দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন—দেখা না পাইয়া লিখিয়াগিয়াছেন যে, 'তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আইস'; রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গেলইয়া কাশীযাত্রা করিলেন এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থানকরিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে জানাইলেন যে, আর তোমার কাশী যাইতে হইবেনা—এই খানেই আমাকে গান শুনাও; রামপ্রসাদ তথায় অনেক গান গাইলেন, তন্মধ্যে একটী গান এই—

কাজ্ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
কেলে মার চরণ কাশী, সেই কালচরণ ভালবাসি,
কাশী মলে হয় মুক্তি, বটে সেই শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের মৃত্যুবিষয়েও এরূপ জনশ্রুতি যে, কালী-

পূজার পর দিন রামপ্রসাদ আপন পরিবারদিগকে আপনার আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া প্রতিমাবিসর্জ্জনের সময়ে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত ৪টী গীত গানকরেন—

"কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনুতরণী ত্বরা করি চলবেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মন কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কুল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে" ॥ ১ ॥

"বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে" ॥২॥

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণমেয়ে, আসান দেমা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো" ॥৩॥

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে॥

শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা—ফাঁকীর উপরে ফাঁকী, ডানচক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা—দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা—আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে" ॥ ৪ ॥

প্রবাদ এইরূপ যে, এই শেষোক্তগানের "দক্ষিণা হয়েছে" এই অংশটুকু গাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। এই সকল উপাখ্যান কতদূর সত্য বা সম্ভব, তাহালিখিবার প্রয়োজন্ নাই, বিজ্ঞপাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাহউক রামপ্রসাদের বংশীয়েরা কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। তাঁহার প্রপৌত্র বাবু গোপালচন্দ্রসেন ও বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবু কালীপদসেন কলিকাতাতেই বিষয়কর্ম্ম করেন। ইহাঁদের কুমারহট্টস্থ বাসস্থান পড়াটিবি হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্ত লইয়া অনেকক্ষণ গেল; এক্ষণে তদীয়গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকর্ত্তব্য। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ ও প্রধান কবিরঞ্জন বা বিদ্যাসুন্দর। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে তাঁহার যে অপর দুইগ্রন্থ আছে, তাহা ক্ষুদ্র ও কেবল গানময়। তাঁহার কোনগ্রন্থেই সময়নির্দেশক কোন কথা নাই। সুতরাং তাঁহার কবিরঞ্জন কোন্ শকে রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির বলাযায়না; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধহয় যে, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গল

১৬৭৪শকে সমাপ্ত হইয়াছে, একথা তদ্গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬৭০।৭২ শকে রচিত হইয়াছে, অনুমান করাযাইতেপারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরীত অনুমানও করিয়াথাকেন—তাঁহাদের বোধে কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের পর। কিন্তু একথা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়াবোধহয়না। যেহেতু অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জনরচনা করা প্রবহমাণ নদীসন্নিধানে সরোবরখননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য হয়। প্রধানকবি রামপ্রসাদ তত অবিবেচক ও অসহৃদয় ছিলেন, ইহা সম্ভবহয়না। বরং এইরূপ সম্ভব যে, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনাকরিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিলে তিনি উহা পাঠকরিয়া পরমপরিতুষ্ট হয়েন; কিন্তু উহাকে আরও বিশোধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সভাসদ ভারতচন্দ্ররায়গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহা বিশোধিত না করিয়া ঐ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসাদিযোজনা করিয়া নিজে এক বিদ্যাসুন্দর লেখেন এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াদেন এবং রচনামুখে উপাখ্যানাংশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তকরেন। সে পরিবর্ত্ত প্রধানতঃ এই—কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের

পরস্পর সন্দর্শনাদির পর, তাঁহারা যেরূপে গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবগত ছিল—রায়গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না এবং কবিরঞ্জন বিদ্যার গৃহ ও শয্যায় সিন্দূর মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন, রায়গুণাকর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া কোটাল ও তাহার ভ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেইগৃহে রাখিয়া মহারসিকতাসহকারে চোরকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারী-শুক দুইটী গুণাকরের নিজের পোষাপক্ষী। এ ছাড়া আর আর যে বিভিন্নতা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী রামপ্রসাদেরও স্বকপোলকল্পিত নহে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সে পুস্তক পাইলাম না। জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী বাগেরহাট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবুপঞ্চাননঘোষমহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক "সুন্দরকাব্য" নামে দ্বাদশসর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দর আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীনগ্রন্থ নহে—একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত। ঐ গ্রন্থে কবিত্বশক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য

নাই—তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমানকরাযায়না। যেহেতু তাহা হইলে উহাঁদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যেসকল বৈচিত্র্য আছে, তাহা তিনি কখনই ছাড়িতেন না। বরং এরূপও কতক বোধহয় যে, রামপ্রসাদ ঐ গ্রন্থ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই কবিরঞ্জন রচনাকরিয়াছিলেন; কারণ ঐ উভয় পুস্তকের অনেক অংশে ঐক্য আছে। স্থূলকথা এই যে, উক্ত-গ্রন্থবর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাসুন্দরের চলিত উভয়বিধ উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হীরার স্থলে বিমলা, গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঘাইএর স্থলে রাঘব ইত্যাদি কয়েকটী নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণাকরের যে দুইরূপ কৌশল আছে, উহাতে তাহার কোন রূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দানস্থলে ও বিচার-সময়ে উক্ত দুই বিদ্যাসুন্দরেই যে সংস্কৃতশ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই কিন্তু সেস্থলে অপ-রবিধ শ্লোক রচিতহইয়াছে। চোরপঞ্চাশৎ নামক শ্লোকের একটীও উহাতে নাই—তবে ২। ৪টী কবিতায় চোরপঞ্চা-শদ্বর্ণিত কোন কোন শ্লোকের ভাব লক্ষিতহয় এইমাত্র। ফলতঃ উক্ত সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরহইতে ভাষা দুইখানিই বিদ্যা সুন্দর রচিতহইয়াছে? কি ভাষাবিদ্যাসুন্দরের অন্যতরকে অবলম্বন করিয়া ঐ 'সুন্দরকাব্য' রচিতহইয়াছে? তাহার কোন স্পষ্টপ্রমাণ পাওয়াযায়না।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক* আমরা পাইয়াছি—এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তিপ্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনেসমাগমবিহার ও রাজসমীপে তাহাপ্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমান বীরসিংহ সুরঙ্গ প্রভৃতির কোন কথা নাই। এপুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না? তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহাহউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধহয়না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তকরচয়িতার যে, কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফল কথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে—যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারই স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন গ্রন্থ*? তাহা স্থির বলিতে পারযায়না।

---

* এই প্রস্তাবের মুদ্রণকালে আমরা "বররুচিবিরচিতং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নামে একখানি মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহা আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই গ্রন্থই প্রায় অবিকল। কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎটী অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকে চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একেবারে নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বেও প্রাণরামচক্রবর্ত্তী নামে এক কবি বররুচিপ্রণীত প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কালিকামঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শ করিয়া কবিরঞ্জন রচনা-করেন—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াও কোথাও কালিকামঙ্গলের একখণ্ড পাইলাম না—সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারাগেলনা। কিন্তু এঁস্থলে একথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, কবিরঞ্জন নিজগ্রন্থমধ্যে রাজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদিবর্ণনাপ্রসঙ্গে যে পাঁচটী শ্লোক উদ্ধারকরিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র ঐস্থলে যে ৫০টী শ্লোক 'চোরপঞ্চাশৎ' নামে তুলিয়া তাহার দুইপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি বর্দ্ধমানস্থিত সুন্দরচোরের রচিত নহে। ঐ সকল শ্লোক 'চোর' নামক একজন প্রাচীন কবির রচিত। জয়দেব প্রসন্ন রাঘবনাটকের প্রথমে ঐ চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা—

যস্যা শ্চোর শ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায় ॥

"যার শিরে শোভে 'চোর' চিকণ চিকুর।
'ময়ূর' যাহার কর্ণে মণিকর্ণপূর ॥
'হাস' যার হাস, 'হর্ষ' হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস ॥

পঞ্চবাণ 'বাণ' যার হৃদয়মাঝারে।
কবিতাকামিনী হেন না ভুলায় কারে॥" (র. স.)

এতদ্ভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে—যথা—

"কবি রমরঃ কবি রমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ"। ইত্যাদি।
যাহাহউক, ঐ চোরকবির প্রকৃতনাম বিহ্লণ; তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেশের কোন রাজকন্যার অধ্যাপনাকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বন্ধ হওয়ায় গোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়—রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বিহ্লণকে বধকরিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে তিনি তথায় বসিয়া ঐ সকলশ্লোক রচনাকরেন *। এক্ষণে কালিকামঙ্গলকারই হউন, বা রামপ্রসাদই হউন প্রথমে ঐ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয়বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নামান্তরে প্রবেশিত করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন, গ্রন্থমধ্যে পুষ্পচয়নানন্তর সুন্দরসমীপাগতা হীরামালিনীর চরিত, চৌরান্বেষণসময়ে বিদু ব্রাহ্মণীর বিদ্যাসন্নিধানে যাইয়া কথারম্ভ, কোটালচরগণের বৈষ্ণব, ফকির, উদাসীনপ্রভৃতির বেশধারণপ্রসঙ্গে উহাদিগের আভ্যন্তরিক-অবস্থা, চৌরদর্শনে নাগরিকদিগের মনেরভাব প্রভৃতি অতি প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন—

---

* রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্ব্বের ১১ খণ্ডে এবিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে।

"কাল কর পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ আসি বটে সেই॥" "যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্তগজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল নহে সে উরজ॥" "উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু। মনো-মীন ধরিল ধীবরমীনকেতু।" "কাস্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি। করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥"

"ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা, বিন্দু২ বহে পড়ে রক্ত। তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার, গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥" "কোন্ ধর্ম্ম, হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম, গাত্রচর্ম্ম, দিয়া দিব পাদুকা চরণে। হৃদয়েশ, এই বেশ, পায় ক্লেশ, কৃপালেশ, কর ভাই অকাল মরণে॥"

এইরূপ ভূরি ভূরি স্থলে তিনি যে, কতই ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানেস্থানে তাঁহার স্বভাবোক্তিবর্ণন যে, কিরূপ সুমধুর হইয়াছে, তাহা বলা-যায়না। ইহাঁর রচনায় "বিদ্যা মর্ লো কলঙ্কিনী ঝী।" ইত্যাদি রূপ, ২। ১টী ধুয়াও আছে। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় 'কৈসন' 'যৈসন' ইত্যাদি হিন্দিশব্দমিশ্রিত এবং মাধবভাট প্রভৃতির উক্তিতে শুদ্ধহিন্দিগ্রথিত বর্ণনাও অনেক দেখিতেপাওয়াযায়। ইতিপূর্ব্বে রামেশ্বরের যে শিব-সঙ্কীর্ত্তনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার রচনায় যেরূপ অনুপ্রাস-চ্ছটা লক্ষিত হয়, ইহার রচনায়ও প্রায় সেইরূপ। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে কয়েকটী লিখিত হইল—

"ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুশোভায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥" "সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত-তপনীয়-তনু তারাপতি প্রায়॥" "নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে॥" "শিরে হানি পাণি বাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝী॥" ইত্যাদি—

এইরূপ অনুপ্রাসানুসন্ধানের জন্যই হউক বা যেকারণেই হউক রামপ্রসাদের রচনা সকলস্থলেই ললিত কোমল ও সুমধুর হয়নাই। অনেকস্থলে অসুন্দর ও কর্কশ লাগে। এবং কয়েকস্থলে নিতান্ত গ্রাম্য ও অশ্লীলবর্ণনাও আছে। তিনি নিজেই একস্থলে প্রকারান্তরে গর্ব্ব করিয়াছেন—

"কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
সে বোঝে অক্ষরকালী হৃদে আছে যার॥"

একথাও যথার্থবটে, তাঁহার কাব্যের অনেকস্থান সকলের বোধগম্য হয়না। কিন্তু সেরূপ অবিশদরচনা কবির প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয়, তাহাপাঠকগণেই বিবেচনা করিবেন। তিনি কয়েকস্থলে কতকগুলি সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ করিয়াদিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদগুলি এতই অস্পষ্ট যে, যাঁহারা সেই মূলশ্লোক না জানেন, তাঁহাদের উহা বোধগম্যহয়না।

পূর্ব্বে যেসকলগ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কবিরঞ্জনে অধিকপ্রকার নূতনছন্দ আছে। পয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ লঘু ও ভঙ্গত্রিপদী, চতুষ্পদী, তোটক, একাবলী, দিগক্ষরা এবং আরও দুই একটী নূতনগোছ ছন্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যেও অক্ষর, মাত্রা ও মিলের বৈষম্যাদি দোষও দেখিতে পাওয়াযায়॥

রামপ্রসাদপ্রণীত কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খলরূপে নিবদ্ধ নহে—উহার অধিকাংশই কেবল গানময়। অন্যছন্দোরচিতও যাহা আছে, তাহাতে অক্ষর বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। কি অভিপ্রায়ে কবি এরূপরচনা করি-

য়াছিলেন, বলিতে পারাযায়না। বোধহয় ওগুলি কোনরূপ গীত হইবে। কিন্তু ঐসকলগীতে যে অতি উৎকৃষ্টভাব আছে, তাহা সকলকেই স্বীকারকরিতেহইবে। গান স্বরসংযোগে গাইলে যেরূপ মিষ্টলাগে, কথায় বলিলে সেরূপ লাগেনা; অতএব গানশক্তিসম্পন্ন পাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা গাইয়া দেখিবেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন কিরূপ মধুরপদার্থ। উহার একটী গান এই—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধদিতে উমারে। উমা কেঁদেকরে অভিমান, নাহিকরে স্তনপান, নাহিখায় ক্ষীরননী সরে॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহারে। কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিনও মুখদেখি, মায়ে ইহা সহিতে কিপারে? আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি কোথারে। আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরাযায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥ উঠেবোসে গিরিবর, করি বহুসমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে। সানন্দে কহিছে হাসি, ধরমা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে॥ মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যেগ্রন্থের কথা শুনাযায়, তাহা দুষ্প্রাপ্য। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তমহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার কয়েকটী শ্লোক বৈ বাহির করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার সমালোচনাকরার আর প্রয়োজন হইতেছেনা। যাহাহউক এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে কোনপুস্তকে অমুদ্রিত আর কয়েকটী রামপ্রসাদী গীতমাত্র নিম্নভাগে লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করাগেল—

" মন কৃষিকাজ তোর এসেনা।
এমন মানবজনম রইল পড়ে, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীনামের দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবেনা।
সে যে শক্ত বেড়া মুক্তকেশী, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।
অদ্য অব্দশতান্তেবা বাজাপ্ত হবে জাননা।
এখন্ আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল্ কেটে নেনা।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, তায় ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
ওরে একলা যদি না সেচ্‌তে পারিস্, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা " ॥ ১ ॥

" মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক্ ঢাকা বলদের মত ॥
বেঁধে দিয়ে ভবের গাছে, পাকদিতেছ অবিরত——
একবার খুলে দেমা চখের ঠুলি, হেরি তোর ঐ অভয়পদ " ॥ ২ ॥

" এবার কালী তোমায় খাব।—খাবগো ওদীনদয়াময়ি।
এবার তুমি খাও কি আমি খাইমা, দুটার একটা করে যাবো।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন্ শমন কর্‌বে দমন, সেই কালী তার মুখে দিবো " ॥ ৩ ॥

" এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
ঐ যে ধর্‌বো চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে,
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দেক্ আমারে।
মায়ের ধন পায়না বেটায়, সেধন নিলে কোন্ বিচারে,
ভোলা, মায়ের চরণ, করে ধারণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥ ৪ ॥

মধ্যকালের বিবরণে আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত হইতে আরম্ভকরিয়া কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্তের এক প্রকার সমালোচনা করিলাম। ঐকালের মধ্যে আমাদিগের সমালোচিত কয়েকখানি ভিন্ন যে আর কোনগ্রন্থ রচিত হয়নাই, একথা কে বলিতে পারে ? আমরাই কয়েক খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াও অনাবশ্যকবোধে সমালোচনা করি নাই। তদ্ভিন্ন হয়ত অনেকমহাশয়রচিত অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত . হইয়াগিয়াছে, অথবা বিদ্যমান থাকিতেও আমরা অনেকগ্রন্থের সন্ধান পাইনাই। যাহাহউক, মধ্যকালে ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথাক্রমে সমালোচিত তত্তদ্গ্রন্থের বিবরণেই একপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত—কবিকঙ্কণ—মহাভারত ও কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের ভাষা কিছু একরূপ নহে। উহা যে, ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত, বিশদ ও অধিকসংস্কৃতশব্দগর্ভক হইয়াআসিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতেপারাযায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতেহইবে যে, ঐ সময়ের যে ভাষা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, তৎসমুদয়ই পদ্যময়। পদ্য দেখিয়া ভাষার অবস্থা সম্যক্‌রূপে বোঝাযায়না; কারণ যে সকল কথা লোকে কথোপকথনে ব্যবহার করেনা, পদ্যমধ্যে তাদৃশ অনেক কথাও ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অতএব ভাষারবিষয়ে বিবেচনাকরিতেহইলে শুদ্ধ পদ্যগ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া গদ্যগ্রন্থের প্রতিও দৃষ্টিপাতকরা কর্ত্তব্য। কিন্তু মধ্যকা

লের গদ্যগ্রন্থ আমরা একখানিও দেখিতে পাইনাই। শুনিতে পাওয়াযায়, ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত, এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ ঐকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার একখানিও দেখিতেপাওয়াগেলনা—অনেক চেষ্টা করাগেল, কোনরূপে সুযোগ হইয়াউঠিলনা। সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলিতেপারাগেলনা। তাহা না পারাযাউক, ইহা বেশ দেখা যাইতেছে যে, মধ্যকালেও গদ্যগ্রন্থ প্রায় হয়ই নাই। ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্যগ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে, মধ্যকালে তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও একালের মধ্যে রচিত হয়নাই। সুতরাং এ অংশে আদ্যকাল ও মধ্যকালের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।

তবে এই কালের মধ্যে ছন্দের অনেক পারীপাট্য হইয়াছে—কিন্তু সে পারীপাট্যও প্রথমে হয় নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে কিছু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যকালও ইদানীন্তন কালের যেসন্ধিস্থল—রামপ্রসাদের কাল—তাহাতেই উহার প্রচুরপরিমাণ লক্ষিতহইতেছে। রামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীনকবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতেপাওয়াযায়— যথা ময়ি=হই; কি=ঝী; থো=পো ইত্যাদি। এই

মিলদোষজন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও ইহাঁকে আমরা মধ্যকালের শেষে এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তনকালের প্রথমে উপবেশিত করিলাম—নচেৎ ইহাঁদিগকে একগৃহে বসাইলেই চলিত। যাহা হউক এই কালে যে সকল নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিরঞ্জনের তোটকটী কেবল সংস্কৃতের অনুকৃতি—উহার প্রতি অর্দ্ধ-দ্বাদশঅক্ষরে ঘটিত এবং প্রতিতৃতীয়অক্ষর গুরু। তদ্ভিন্ন আর আর সকল ছন্দই পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র। পয়ারেরই প্রতি চতুর্থবর্ণে মিল ও যতি থাকিলে মালঝাঁপ, কয়েকটী বর্ণ কমাইয়া দিলে একাবলী; ত্রিপদীরই পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই চরণ না থাকিলে ভঙ্গত্রিপদী প্রভৃতি হইয়াথাকে। ঐ মালঝাঁপপ্রভৃতি নামসকল প্রাচীন নহে; বোধ হয় প্রথমকবিরা রচনাসময়ে ওরূপ নাম জানিতেন না—অক্ষর যতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তাদি করিলে আর এক প্রকার নূতন মিষ্ট ছন্দ হয়, দেখিয়া তাঁহারা ঐ সকল ছন্দের সৃষ্টি করিয়াগিয়াছেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকলের অর্থানুরূপ নামকরণ ও লক্ষণ স্থির করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

প্রথমভাগ সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৪	ত্রিকোণে	ত্রিকোণ
২	৯	জেষ্ঠা	জ্যেষ্ঠা
৩	৩	আকবর	সায়দ হোসেন
১১	১	লৌলিক	লৌকিক
১৪	১৪	অৰ্দ্দ	অৰ্দ্ধ
১৭	১৯	বিদ্ধ	বদ্ধ
৩০	৫	বিদ্য	বিদ্যা
৩০	১৭	পঙ্ক ॥	পঙ্ক ॥ (প, ক, ৩, ৮৬৮)
৯৩	২০	পারিনা; কিন্তু	পারিনা।
১২১	৭	গঙ্গাধর	গদাধর
১৩১	১৩	মাহামার	মহামার
১৩৬	১৮	তদ্রাশ্রয়ে	তদাশ্রয়ে
১৪৬	১১	কৃত্যবিদ্য	কৃতবিদ্য
১৫৪	৮	ব্রহ্মরন্ধ	ব্রহ্মরন্ধ্র